জীবনব্রত বা গান্ধীবাদ

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

জীবনব্রত বা গান্ধীবাদ

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীহেমপ্রভা দেবী কর্তৃক
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
জানুআরি—১৯৪৭

প্রথম সংস্করণ ২,২০০—১৯৩১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১,০০০—১৯৪৭

প্রিণ্টার—শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা।

সূচী

জীবনব্রত

ধর্মনীতি

সর্বহিত

শ্রীদুর্গেশ্বরী গোস্বামী — ৩-৪-৪৮

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন

গান্ধীজীর প্রশংসমান দৃষ্টি বাংলার উপর বরাবর রহিয়াছে। বাংলার সহিত প্রেমের সম্পর্ক বর্ধিত হোক, এই ইচ্ছা তাঁহার তীব্র রহিয়াছে। বাঙ্গালীর বাংলা সম্বন্ধে যে প্রকার অভিমান আছে, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে অভিমান গান্ধীজীর তদপেক্ষা কম নয়। বাংলার কৃতী পুরুষেরা তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তলে স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজ বাংলার অনেক নর-নারীর সহিত তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কেই বদ্ধ।

তাহা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে তাঁহার মত, তাঁহার ভাবধারা এখনো তেমন করিয়া অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজীকে ভালবাসিলেও বাংলার সমাজের উপর তাঁহার প্রভাব আরও অধিকতর হওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। বাংলাদেশের শিক্ষিতদের ভিতরেও অনেক লোক গান্ধীজীকে ভাল করিয়া জানেন না। তাঁহার প্রতি একটা বিরাট শ্রদ্ধা আছে—এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁহার মতবাদের সহিত, তাঁহার জীবনধারার সহিত অনেকেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন। গান্ধীজীর জীবনী, গান্ধীজীর সৃষ্ট সাহিত্য, গান্ধীজীর ভাবধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারাই এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে পারে। সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলে বাংলার শুভ, ভারতবর্ষের শুভ।

এই ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া গান্ধীজীর লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি বাংলার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাতে গান্ধীজীর লেখা সকলেই পড়িতে পারেন, সকলেই গান্ধীজীকে জানিতে পারেন, সেজন্য খুব অল্প মূল্যে তাঁহার লেখার অনুবাদগুলি বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

গান্ধীজীর জীবনই ব্রতের সমষ্টি একথা বলা যায়। যে ব্রত তিনি নিজে পালন করেন, তাঁহার অনুগামীরাও সেই ব্রত পালন করিয়া উন্নত জীবন যাপন করেন—ইহাই গান্ধীজী ইচ্ছা করিয়া থাকেন। মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য যে সকল ব্রত পালন করা আবশ্যক, সে সকল ব্রত সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আশ্রমের ভিতর দিয়া জীবনের আদর্শের রূপ দান করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন। আশ্রমবাসীদের দায়িত্ব ও তাঁহাদের প্রতি তাঁহার নিজের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া গান্ধীজীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঐ সবরমতী আশ্রম দিয়াই তাঁহার জীবনের বিচার করা হইবে।

ভারতের জন্য স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষণার পর যখন তিনি বন্দী হইয়া য়েরোড়া জেলে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি সত্যাগ্রহাশ্রমবাসীদের অনুরোধে তাঁহাদিগকে প্রার্থনার পর পাঠের জন্য কিছু লেখা পাঠাইয়া দিতে স্বীকার করেন। তারপর হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে আশ্রমবাসীদিগকে ব্রত সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাইতে থাকেন। গান্ধীজীর নিকট জেল ত ছিল মন্দির। ভগবৎ ভক্তের নিকট সকল স্থানই মন্দির। তবে গান্ধীজী জেলের মধ্যে ভগবৎ সান্নিধ্য অধিকতর অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন বলিয়াই হয়ত য়েরোড়া জেলকে মন্দির বলিয়া থাকিবেন। য়েরোড়া মন্দির হইতে প্রেরিত ব্রতের বিষয়ের এই প্রবচন, গান্ধীজীর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি গণ্য করি। তিনি এই 'ব্রতবিচারে' যাহা বলিয়াছেন তাহা নানা স্থানে পূর্বে নানা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এইবারকার এই সমষ্টি যেন ভাষার সরলতায়, বাক্যের অল্পতায়, ভাবের গভীরতায়, দানের পরিপূর্ণতায় পূর্বের সমস্ত দান অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে আনন্দ অনুভব করিতেছি।

বাংলার শ্রেষ্ঠদিগের সমাজে বাংলার রাজনৈতিক সমাজে আজও ধর্ম ও নীতি আচরণের কথা উঠিলে কেহ কেহ উহা অতিশয় উচু কথা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। গান্ধীজী তাঁহার দেশবাসীর নিকট হইতে কেবল যে নীতি-সঙ্গত ব্যবহারই পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাই নহে, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা এতটুকু কমেও সন্তুষ্ট নহেন।

যে সকল মহাব্রত সম্বন্ধে তিনি আশ্রমবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন উহা 'ব্রতবিচার' নামে গুজরাটীতে প্রকাশিত হয়। তাহারই বঙ্গানুবাদ "জীবনব্রত" নাম দিয়া বাহির হইল। ইহার সহিতই গান্ধীজীর পূর্বেকার লেখা 'ধর্মনীতি' বহিখানারও অনুবাদ দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত গান্ধীজীর লেখা 'সর্বোদয়' বা 'সর্বহিত' বহিখানার অনুবাদও দেওয়া হইল। 'সর্বোদয়' বহিখানা রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' বহিখানার অনুবাদ বা অবলম্বনে লিখিত। গান্ধীজীর মনে এই বহিখানা গভীর ছাপ ফেলিয়াছিল ও তাঁহাকে বিষম সাংসারিক পরিবর্তনের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। গান্ধীজীর জীবনীর ও চিন্তাধারার পাঠকের নিকট এই পুস্তক অত্যন্ত পরিচিত। গান্ধীজীর 'সর্বোদয়' পড়িলে গান্ধীজীর কর্মতত্ত্বে প্রবেশ করা সহজ হইয়া পড়িবে।

'ব্রতবিচার', 'ধর্মনীতি' ও 'সর্বহিত' এই তিনখানা ছোট ছোট উপদেশ পুস্তক একত্র করিয়া "জীবনব্রত" নাম দিয়া অনুবাদ করা হইল। আশা করি বাঙ্গালী পাঠক এই উপদেশ দ্বারা সত্য ও কল্যাণের পথে অধিকতর অগ্রসর হইবেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় মুদ্রণ কার্যের ভার লওয়াতেই এই বইখানি প্রকাশিত হইতে পারিল। গুজরাটী অনুবাদ করিতে করিতে আমার ভাষায় যেখানে বেজায় গুজরাটী ধাঁচ আসিয়া পড়িয়াছে, হেমেন্দ্র বাবু উহা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবু আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেও তাহা জ্ঞাপন করা আমার প্রয়োজন নাই, কেবল সত্য প্রকাশের অনুরোধেই হেমেন্দ্র বাবুর উল্লেখ করিতেছি।

সেণ্ট্রাল জেল
ফেব্রুআরি, ১৯৩১

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

গান্ধীজীর জীবন-কথা

বাল্যকাল

গত ১৯৩০ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর ৬১ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি ১৮৬৯ সালে পোরবন্দরে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ তিন পুরুষ ধরিয়া রাজমন্ত্রিত্ব করেন। গান্ধীজীর পিতা ও খুড়া মহাশয়ও রাজমন্ত্রী ছিলেন। গান্ধীজী পোরবন্দরে জন্মিয়া সেখানে বছর সাতেক পর্যন্ত বড় হন ও প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তাঁহার পিতা করমচন্দ গান্ধী রাজকোটে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। রাজকোটেই গান্ধীজী ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়া পাস করেন। সাত বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত—এই এগার বৎসর কাল রাজকোটে কাটে। যে সকল হৃদয়বৃত্তি এক্ষণে গান্ধীজীর গান্ধীত্ব, সে সকল বৃত্তি এই সময়েই বিকাশ পায়। গান্ধীজী নিজেও সেই সময়েই ঐ বৃত্তিগুলির প্রতি জ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। বাপ-মার প্রতি গভীর প্রেম, তাঁহাদের জন্য একটা একনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন সেবাভাব এই সময়েই দেখা দেয়। স্কুল হইতে ছুটি পাইলেই, বাড়িতে আসিয়া বাবাকে শুশ্রূষা করার জন্য মন ছুটিত। এই সময় দুইটি কাহিনীতে গান্ধীজী বড়ই তৃপ্তি পান। তাঁহার অন্তরের সুরের সহিত উহা মিলিয়া যাওয়ায়, উহাদের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। একখানা পিতৃভক্তির কাহিনী। শ্রবণ তাহার পিতামাতাকে ঝোলায় করিয়া লইয়া যাইতেছে—এই দৃশ্য তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তিনি উহা ভাবিতেন এবং নাটকে শ্রবণের গান পড়িয়া উহা গাহিতেও তাঁহার ইচ্ছা করিত। আর একটি কাহিনী ছিল হরিশ্চন্দ্রের। ঐ নাটক দেখিয়া তাঁহার মনে হয় যে, সকল লোক কেন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সত্যপরায়ণ হয় না। এই সত্যপরায়ণতা তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি, উহা পোষণ করার বা পালন করার জন্য তাঁহাকে আয়াস করিতে হয় নাই। হরিশ্চন্দ্র আজও গান্ধীজীর কাছে সত্য। হোক উপাখ্যান, হোক না কেন তৈরি গল্প! কিন্তু সত্যব্রত হরিশ্চন্দ্র তাঁহার কাছে সত্য। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মতই সত্যের জন্য যত দুঃখ হোক, সহ্য করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এই সত্য পালনের জন্য জাগৃতি দরকার, সাবধানতা আবশ্যক, ইহা সত্য

পালনের অপরিহার্য অঙ্গ। গান্ধীজী সেই সময়েই ইহা বুঝিতে পারেন ও সতর্ক হন। স্কুলে নিয়ম ছিল, বৈকালে আসিয়া ব্যায়াম করিয়া যাইতে হইবে। তিনি সে দিন মেঘলা বলিয়া সময় বুঝিতে পারেন নাই। যখন স্কুলে গিয়াছেন, তখন ব্যায়ামের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি যে আসিয়াছিলেন, সে কথা হেডমাস্টার বিশ্বাস করেন না ও সাজা দেন। তখনই তিনি আর্ত হইয়া ভাবেন যে, তিনি যে আসিয়াছিলেন, তাহা হেড-মাস্টারের নিকট কি করিয়া প্রমাণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একথাও বুঝিতে পারেন যে, সত্য যে বলিতে চায় ও সত্য যে পালন করিতে চায়, তাহার অসাবধান হওয়া চলে না। পাঠাভ্যাসের সময় অসাবধানতা এই তাঁহার প্রথম ও শেষ।

বাল্যকালেই তের বৎসর বয়সের সময় গান্ধীজীর বিবাহ হয়। বিবাহ হওয়ার উৎসবে সে বৎসর পরীক্ষায় পাস করিতে পারেন নাই, পরের বৎসর ডবল প্রমোশন লইয়া, খুব খাটিয়া তবে ক্লাসের সহিত চলিতে সক্ষম হন। তিনি আঠার বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেন।

বিবাহের সম-সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু জুটিয়াছিল, সে তাঁহাকে বিপথে পরিচালিত করে। সে তাঁহাকে গোপনে মাংস খাইতে শিখায়। তিনি ৫।৬ বার খাইয়া, উহাতে পিতামাতার নিকট অসত্য আচরণ করা হইতেছে জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন। মাংসাহারের প্রবৃত্তির মূলে ছিল জোরালো হওয়ার ইচ্ছা, যাহাতে ইংরেজ তাড়াইতে পারা যায়।

ছেলেবেলা হইতেই রামনামে তাঁহার একটা অন্ধ শ্রদ্ধা ছিল। রম্ভা তাঁহার দাই ছিল। সে-ই ভূতের ভয় হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য রামনাম করিতে শিখায়। পরে রামনামের অপূর্ব শক্তির পরিচয় তিনি পান। ছেলেবেলাতেই যে সব নীতিকথা পড়িতেন, তাহার ভিতরে যাহা ভাল লাগিত, তাহা কাজে করিতেও যত্ন করিতেন। এই ভাবেই, যে অশুভ করে তাহার প্রতিও শুভ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি গান্ধীজীর ভিতরে তখন হইতেই দেখা দেয়।

তিন বৎসর বিলাত প্রবাস

ম্যাট্রিক পাস করিয়া কয়েক মাস কলেজে পড়িয়াই, গান্ধীজী বিলাতে ব্যারিস্টার হইতে যান। সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া দুই তিন হাজার টাকা হয়; তারপর যাহা লাগিবে, তাহা

তাঁহার দাদা যেমন করিয়া হোক সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার ভার লইয়া, তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার দাদা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। গান্ধীজীর পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিতে মায়ের বড়ই কষ্ট হয়। বিলাত যাত্রার পূর্বে গান্ধীজীকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা তিনটি এই—বিলাতে গিয়া তিনি মদ্য খাইবেন না, মাংস খাইবেন না এবং স্ত্রী-সংসর্গ করিবেন না। গান্ধীজীকে এই প্রতিজ্ঞা তিনটি খুব বাঁচাইয়াছিল, কারণ ঐ সকল প্রলোভনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

বিলাতে গিয়া নিরামিষ খাওয়া লইয়া বড় অসুবিধা হয়। প্রথম কিছুকাল ত আধপেটা খাইয়া বা না খাইয়াই কাটান—সঙ্গে খাবার লইয়াছিলেন, তাহাতেই চালান। পরে নিরামিষ ভোজনাগারের সন্ধান পাওয়ায় আহারের ভাল ব্যবস্থা করেন। সেইখানেই নিরামিষ ভোজনের সমর্থনকারী পুস্তক দেখিতে পান। তাহা পড়িয়া গান্ধীজীর নতুন দৃষ্টিলাভ হয়। এতদিন, মায়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করার জন্যই মাংসাহার করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও মাংসাহার করা যে ভাল, তাহাতে দেশের উপকারই হইবে—এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। গুজরাটের বৈষ্ণব-সন্তানের পক্ষে মাংসাহার মৃত্যু-তুল্য। তথাপি তিনি ঐ কার্য হিতকর ভাবিতেছিলেন। স্কুলের শিক্ষায় ও তৎকালীন সভ্যতার ফলেই এই ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক্ষণে নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে বহি পড়িয়া তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ধার্মিক, বৈদ্যক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নিরামিষ আহার সমর্থন করিবার যুক্তি পাইলেন। পূর্বে যেমন ইচ্ছা হইত সকলে মাংসাহারী হোক, এইবার ঠিক তাহার বিপরীত ইচ্ছা হইল এবং যেন নতুন একটা ধর্মের দ্বার তাঁহার কাছে খুলিয়া গেল। বিলাত-প্রবাস কালে, এই নিরামিষ ভোজনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। পরবর্তীকালেও, নিরামিষ ভোজন-গৃহের সহিত তাঁহার জীবনের অনেক মূল্যবান ঘটনা ও স্মৃতি জড়িত।

নিরামিষভোজীদিগের সমিতি ছিল। গান্ধীজী তাহাতে যোগ দিলেন। যে পাড়ায় ছিলেন, সেই পাড়ায় একটা সমিতি স্থাপিত করিলেন। লণ্ডনের প্রধান প্রধান যে সব লোক নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী বা প্রচারক ছিলেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। দিন দিন নিরামিষ আহারের বিভিন্ন উপযোগিতা তাঁহাকে মোহিত করিতে লাগিল। কেবল নিরামিষ নহে,

আহার্য সম্বন্ধে অন্য পরীক্ষাও তিনি এই সময়েই আরম্ভ করিলেন। আস্বাদের বাস্তবিক কেন্দ্রস্থান যে জিহ্বা নয় মন, তাহাও তিনি আবিষ্কার করিয়া কাজে লাগাইতে লাগিলেন। বিনা মসলায় যে খাদ্য পূর্বে রুচিত না, তাহা এখন ভাল লাগিতে লাগিল।

এই নিরামিষ ভোজনাগার সূত্রে, তাঁহার সম্মুখে অনেকগুলি বিষম পরীক্ষা আসিয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ভ্যানকানার বলিয়া একটা বায়ু-পরিবর্তনের স্থান আছে। সেখানে নিরামিষভোজীদের এক সভায় গিয়া, ঐ স্থানে এক বাড়িতে অতিথি হন। গৃহস্থ-কন্যা তাঁহার সহিত অতি স্বচ্ছ কৌতুকের সহিত ব্যবহার করেন। হয়ত অপর কেহ এই প্রকার মেলামেশায় মোহিত ও অকৃষ্ট হইত, কিন্তু গান্ধীজী বাঁচিয়া যান। আর একবার ব্রাইটনে অপর একটি ভোজনালয়ে, নিরামিষ আহার সম্পর্কে এক বয়স্কা মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। লণ্ডনে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার সহিত ঐ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই বাড়ির এক যুবতী কন্যার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বাড়িতে থাকে; মহিলাটিও হয়ত যাহাতে বিবাহ হয়, সেই দিকেই তাঁহাকে প্রলোভিত করিতেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সৎবুদ্ধি তাঁহাকে রক্ষা করিল। তিনি পত্রের দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি বিবাহিত এবং যে পাপ অঙ্কুরিত হইতেছিল তাহা সমূলে নাশ করিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভয়ংকর অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তিনি পোর্টসমাউথ বন্দরে। এখানেও নিরামিষ-ভোজীদিগের এক সম্মিলনে তিনি গিয়াছিলেন। সেখানে যে বাড়িতে থাকার স্থান হয়, সে বাড়িটা ভাল ছিল না। তিনি ও অপর একজন ভারতীয় বন্ধু একত্র গিয়াছিলেন। এই সময় পতিত হওয়ার উপক্রমেই ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করেন। গান্ধীজী এই সম্পর্কে বলেন যে, তিনি যে উদ্ধার পাইয়াছেন, সে কেবল ঈশ্বর বলপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া। ইংলণ্ডে প্রবাস-কালে প্রথম কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায়, তাঁহার বন্ধুদের কথায় ও আচরণে মনে হয় যে, তাঁহাকে ইংরেজ ভদ্রলোক সাজিতে হইবে। তিনি এজন্য নাচ ও বাজনা শিক্ষা করা, বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষা করা ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন। এই কুহক অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি এই দুশ্চেষ্টা নিমেষের সংকল্পে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অধ্যয়নে পুরাপুরি মন দেন। যথাকালে ব্যারিস্টারী পাস করেন। এই সময়ের মধ্যে, তিনি সাধারণ জ্ঞান লাভ করার জন্য লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য পড়েন ও পাস করেন। এজন্য তাঁহাকে ল্যাটিন ভাষা

শিখিতে হয়, ফ্রেঞ্চও শিখিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর বিলাতে কাটান, কিন্তু তবু তাঁহার লাজুক স্বভাব যায় না। দশজনের সভায় দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। দুই চার জনের বৈঠকে বসিয়াও আসর জমাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি বলেন, এই শেষোক্ত ক্ষমতা তাঁহার আজও নাই। যাহা তখন অক্ষমতা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই তাঁহার চরিত্র গঠনের সহায়ক হইয়াছে বলিয়া পরবর্তীকালে গান্ধীজী বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে অল্পভাষী করিয়াছে, তাঁহার বলিবার ও লিখিবার শক্তি এমন করিয়াছে যে, তিনি একটি অনাবশ্যক কথাও ব্যবহার করেন না, যে বাক্য ব্যবহার করেন তাহা ওজন করিয়া করেন। মানুষের স্বভাবতঃই অতিরঞ্জিত করিবার প্রবৃত্তি আছে। উহা সত্যপরায়ণতার বিরোধী। যেজন্য কৌমারে গান্ধীজীর দুঃখ হইত, যে বাকপটুতার অভাবে তিনি নানা স্থানে নানা প্রকারে উপহাসিত হইয়াছেন, সেই বাকপটুতার অভাবই তাঁহাকে সত্যপরায়ণ হইতে সাহায্য করিয়াছে। এক্ষণে গান্ধীজীর ন্যায় বক্তা দুর্লভ। কিন্তু অল্পভাষীতাই ও কেবল আড়ম্বর বিহীন বাক্য-যোজনাই তাঁহার লেখার ও বাক্যের বিশেষত্ব।

ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি ঘটনাক্রমে গীতাপাঠে আকৃষ্ট হন। তখনই এই গ্রন্থ তাঁহার নিকট অপূর্ব লাগে। উহার কতকগুলি শ্লোক তখন যেমন শুনিয়াছিলেন, আজও তাঁহার কানে তাহা তেমনি বাজিতেছে। গীতাকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করেন। এডুইন আরণল্ডের গীতা ও বুদ্ধ-চরিত এই সময় তিনি পড়েন। তাঁহার ধর্মে মতি দেখিয়া খ্রীষ্টান বন্ধু ও থিয়োসফিস্টরা, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহাদের দেওয়া গ্রন্থাদি পড়িতেন, কিন্তু ধর্ম-পরিবর্তনের কথা উঠাইলেই তিনি বিনয়ের সহিত বলিতেন যে, আমি নিজের ধর্মের কিছুই জানি না, সেইজন্য এক্ষণে কোনও ধর্ম-মতের সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। বাইবেলের যীশুর জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। বাল্যকালেই শামল ভট্টের কবিতার ভাবধারা তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও আচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপ্রেমের পরিবর্তে প্রেম, অশুভের পরিবর্তে শুভ দিতে হইবে, এই কথার সহিত যীশুর "এক গালে মারিলে অপর গালও তাহার দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে" এই কথার ঐক্য দেখিয়া তাঁহার অপার আনন্দ হয়। তাঁহার তরুণ মনে গীতা, বুদ্ধচরিত ও যীশুর বাক্যসমূহের সমন্বয়

হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, ত্যাগেই ধর্ম। এই সময় তিনি ধর্মাচার্যদের জীবনী পাঠ করেন—মহম্মদের মহত্ব, বীরত্ব ও তপস্যার কথা জানিতে পারেন। ব্যারিস্টারী পরীক্ষা অতি সহজ জিনিস। নোটবহি পড়িয়া অল্পদিনেই পাস করা যায়। কিন্তু এই সহজ জিনিসকেও তিনি কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট বহিগুলি না পড়িলে অসত্যাচরণ করা হইবে এই বিশ্বাসে, যে কর্ম কোনও ছেলে করে না, তিনি তাহাই করেন। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া আইনের মূল পাঠ্যগুলি কিনেন ও পড়েন। তাহাতে অনেক সময় দিতে হয়। এজন্য পরে উপকার পাইয়াছিলেন। ১৮৯১ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরেন।

ভারতবর্ষে দুই বৎসর

দেশে আসিয়াই জানেন যে, অল্পদিন পূর্বে তাঁহার মা পরলোকে গিয়াছেন। মায়ের উপর দৃঢ় আসক্তি ছিল, সে বন্ধন ঈশ্বর কাটিয়া দিলেন। তিনি এক্ষণে কয়েক মাস বোম্বাইএ ব্যারিস্টারী করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। লজ্জায় যাহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইত না, সে ব্যক্তি ব্যারিস্টারী করিবে কি? যদি তিনি এই সময় দক্ষ ব্যারিস্টার হইয়া বসিতেন, তাহা হইলে হয়ত জগৎ বিশ্ব-সেবকরূপে তাঁহাকে পাইত না। তাঁহার জীবন অন্যভাবে বিকশিত হইবে, তাই যেন ভগবান জোর করিয়াই তাঁহার বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টারী শেষ করিয়া দিলেন। একটিমাত্র ছোট মোকদ্দমা পাইয়া ফী লইয়াছিলেন, কিন্তু যখন প্রতিপক্ষকে জেরা করিতে হইবে, তখন দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, বসিয়া পড়িলেন। পক্ষকে টাকা ফেরত দিয়া কোর্ট হইতে চলিয়া আসেন। তারপর রাজকোটে গিয়া ব্যারিস্টারী করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় স্বল্প কৃতকার্যতা লাভ করেন। মাসিক ৩০০৲ টাকা আয় হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বসিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অদৃষ্ট ধাক্কাইয়া বিদেশে ঠেলিতেছিল। গান্ধীজীর ব্যারিস্টারী করা চলিবে না। যিনি একবার নিতান্ত অসহায় করিয়া বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টারী ত্যাগ করান, সেই ঈশ্বরই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজনে অন্যত্র টানিতেছিলেন। তিনি ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করিতে রাজকোটের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট যান। তাঁহার সহিত গান্ধীজীর বিলাতে একটু নিকট পরিচয়ই হইয়াছিল। তিনি গান্ধীজীকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেন,

চাপরাসী দিয়া অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেন। এই অপমান সেখানে থাকিয়া সহ্য করিতেই তিনি উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, তাহার কোর্টে যাওয়া তাঁহার আর সম্ভব হয় না। এই সময় এক ধনী ব্যবসায়ী, দাদা আবদুল্লা কোম্পানী, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় ব্যবসা করিতেন। ইঁহাদের পোরবন্দরের কারবারের কর্তা গান্ধীজীর দাদাকে জানান যে, তাঁহাদের একটা ৬।৭ লক্ষ টাকার মামলা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। তিনি উহার সাহায্যার্থে গান্ধীজীকে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে চান। কথা ছিল যে, যাতায়াতের প্রথম শ্রেণীর ব্যয় ও খাওয়া পরার খরচ বাদে, ১০৫ পাউণ্ড তাঁহারা দিবেন। এই হাজার-বার-শ' টাকাও দাদাকে সাহায্য করিতে পারিবেন, গান্ধীজী একথা মনে করেন। তাহা ছাড়া কোথাও বাহির হইয়া পড়ার জন্যও তাঁহার মন ব্যস্ত হইয়াছিল। গান্ধীজী আনন্দের সহিত ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন।

প্রথমবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ বৎসর

এই যে ২৪ বৎসরের যুবক ব্যারিস্টার গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তারপর যখন ভারতবর্ষে ১৯১৫ সালে ফিরিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৪৬ হইয়াছে। ২২ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে দুইবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ১৮৯৬ সালে পরিবার লইয়া যাইতে আসিয়া ৬ মাস থাকেন। পরের বার ১৯০১ সালে, গোখলের সহিত থাকিয়া ভারতবর্ষেরই সেবা করিবেন বলিয়া আসেন। কিন্তু আফ্রিকায় জন-সেবার জন্য আহূত হইয়া আবার শীঘ্রই ফিরিয়া যাইতে হয়। তারপর ১৯১৪ সালের শেষভাগে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ইংলণ্ড হইয়া ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর কি অবস্থা তাহা গান্ধীজীর জানা ছিল না। ভারতবর্ষে ভারতীয়েরা ইংরেজের নিকট হইতে যে হীন ব্যবহার পায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহা অপেক্ষাও অধিক পায়। ইংরেজ কর্মচারীর দ্বারা অপমানিত হইয়া রাজকোট ছাড়িলেন, কিন্তু অপমানের প্রতিকার গান্ধীজীর দ্বারা করানোই যেন বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। তাই ভারতবাসী বলিয়াই যে অপমান, তাহার সীমা কোথায়, তাহা দেশ বিদেশে তাঁহার উপর দিয়া বিধাতা পরীক্ষা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে মোকদ্দমা হইতেছিল, তাহার দুই পক্ষ ছিল দুই রাজ্যে। দাদা আবদুল্লা থাকিতেন নাতালে, উহা ইংরেজ-অধিকৃত। আর প্রতিপক্ষ শেঠ তৈয়ব থাকিতেন প্রিটোরিয়াতে, উহা ট্রান্সভালে, বুয়ার-অধিকৃত রাজ্যে। মোকদ্দমা হইতেছিল প্রিটোরিয়ার কোর্টে। গান্ধীজীকে সেইজন্য নাতাল হইতে প্রিটোরিয়ায় যাইতে হয়। তিনি তখন ব্যারিস্টার সাহেব, নিখুঁত পোষাক পরেন ও ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করেন। কিন্তু ভারতীয়কে ফার্স্টক্লাসে চড়িতে দিলে ত! তিনি ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনিয়া রওয়ানা হন, পথিমধ্যে মারিৎস্‌বর্গ (নাতালের রাজধানী), সেখানে গার্ড আসিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে বলেন। গান্ধীজী বলেন, প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে যে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—"যাও কুলিদের গাড়িতে।" গান্ধীজী নামিবার পাত্র নহেন। তখন তাঁহার মালপত্র টানিয়া প্লাটফর্মে ফেলে ও পাহারাওয়ালা ডাকিয়া তাঁহাকে ধাক্কাইয়া কামরা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সঙ্গের কাপড় চোপড় কোথায় মালপত্রের সহিত স্টেশনে রাখিয়া দিয়াছিল! সেখানে বিষম শীত। সেই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাতটা বসিয়া কাটান। পরদিন টেলিগ্রাম করেন। আবদুল্লা শেঠের বন্ধুরা দেখা করিতে আসেন। রেলের কর্তাও, সেই রাত্রির ট্রেনে ফার্স্টক্লাসে যাহাতে তিনি যাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করেন। সে রেল যেখানে শেষ হইল, তাহার পর ঘোড়ায়-টানা বাসে অনেকটা পথ যাইতে হয়। ঘোড়ার বাসের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটও একসঙ্গেই কেনা ছিল। সেখানেও তাঁহাকে চালকের পাশে বসিতে হইল—ভিতরে বসিতে দিল না। কতক পথ যাওয়ার পর পাদানে বসিতে বলে। তিনি অস্বীকার করায় খুব মারিতে থাকে, গালির স্রোত ত বর্ষণ করিতেই ছিল। তিনি নীরবে মার সহ্য করেন, রেলিং আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন ও মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকেন। গাড়ির অন্য যাত্রীর মধ্যস্থতায় মার বন্ধ হয়। পরবর্তী রাস্তা খানিকটা আবার ছিল রেলে। সেখানে ত প্রথমে ফার্স্টক্লাসের টিকিটই দিতে চায় না, পথে এক জায়গায় এ গাড়ি হইতেও গার্ড নামাইয়া দিতে আসে। সহযাত্রী একজন ইংরেজ গার্ডকে ধমক দেন। গার্ড বিরক্ত হইয়া এই বলিয়া চলিয়া যায়—"আপনি যদি কুলির সহিত এক গাড়িতে চড়িতে চাহেন, তবে আমার কি।" এই অভিজ্ঞতা লইয়া গান্ধীজী প্রিটোরিয়া পঁহুছেন। জীবনের সমস্ত স্তরেই সেখানে ভারতবাসীরা অস্পৃশ্য। কি জানি

কেন, এখানে গান্ধীজীর কতকগুলি ইংরেজ-বন্ধু জুটিয়া যায়, ইঁহারা ধর্মভক্ত লোক ছিলেন। ইঁহারা গান্ধীজীকে খ্রীষ্টধর্মে আনিবার জন্য যত্ন করেন এবং গান্ধীজী নিজের ধর্ম ত্যাগ না করিলেও সকলেরই তুল্য প্রেম-ভাজন হইতে থাকেন। তাঁহার খ্রীষ্টান বন্ধুরা তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে নানা পুস্তক পড়িতে দেন। তিনিও আগ্রহের সহিত সেগুলি পাঠ করেন। এই একটা বৎসর ধর্ম-জাগৃতি যেন তাঁহার সহচর হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি আর একবার মার খান। ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা ও নিগ্রোরা রাত্র ৯টার পর রাজপথে বাহির হইতে পারে না, সেজন্য লাইসেন্স চাই। যে মুনিব, সে চাকরকে লাইসেন্স দিতে পারে। গান্ধীজীও লাইসেন্সের অনুরূপ চিঠি সঙ্গে রাখিতেন। সেখানে আবার ভারতীয়দিগকে ফুটপাথে চলিতে দেওয়া হয় না। গান্ধীজী প্রাতঃভ্রমণের জন্য প্রিটোরিয়ার একটা রাস্তার ফুটপাথ দিয়া রোজই যাইতেন। সেই রাস্তায় প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ি ছিল। সেই ফটকের প্রহরীর গা' ঘেসিয়াই তিনি বরাবর গিয়াছেন, কখন কেহ কিছু বলে নাই। একদিন অতর্কিতে একটা বুয়ার পাহারাওয়ালা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ও কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই, তাঁহাকে লাথি মারিয়া ফুটপাথ হইতে নামাইয়া দিল। গান্ধীজীর বন্ধু মিঃ কোট্‌স সেই সময় ঘোড়ায় চড়িয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। তিনি আসিয়াই সিপাহীটাকে খুব ধমকাইলেন, গান্ধীজীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও তাঁহাকে মামলা করিতে বলিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ত গান্ধীই! তিনি বলেন, সিপাহী বেচারা জানে কি, সে নিগ্রোদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, আর তাহার কাছে কালা ত কালা, তাহার মধ্যে আবার ইতর বিশেষ কি? গান্ধীজী নালিশ করেন না। সে লোককে মাফ না চাহিতেই ক্ষমা করেন। তিনি সেই রাস্তায় আর চলিতেন না, কেননা অন্য সিপাহীরা ত এ ঘটনার খবর রাখিবে না, পুনরায় লাথি খাওয়ার আবশ্যক কি? তবে ভারতবাসীর জন্য তাঁহার অনুভূতি ইহাতে আরও তীব্র করিয়া দেয়।

মোকদ্দমাটা বড় জটিল ছিল। উভয়পক্ষই উকিলের খরচ যোগাইতে সর্বস্বান্ত হইতেছিলেন। গান্ধীজীর চেষ্টায় আপোষে মিটমাট হয়। মোকদ্দমা মিটমাট করা, উকিলের ব্যবসায়ের প্রধান কার্য বলিয়া তখন হইতেই তিনি মান্য করিতে শিখিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের প্রতি

প্রেমভাব রাখিয়া মোকদ্দমা মিটানোতেই উকিলের সাফল্য বলিয়া জানিয়াছেন।

এক বৎসর পরে যখন তিনি ফিরিবেন, তখন তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য নাতালের ভারতীয়েরা সমবেত হন। সেই সময় একখানা কাগজে তিনি দেখিতে পান যে, ভারতীয়দের কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়নে যে ভোটের অধিকার আছে, তাহা উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। তিনি সমবেত বন্ধুদিগকে উহার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকেই থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। মাসখানেক থাকিয়া ঐ বিষয়ে আন্দোলনের একটা ফল দেখিয়া তিনি ফিরিবেন স্থির করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজের আস্বাদ তখন তাঁহার সহকর্মীদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না।

গান্ধীজী তখন নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস গঠন করিয়াছেন। ভারতীয়েরা গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসকে প্রচুর চাঁদা দিবেন ও তাহাদ্বারাই গান্ধীজীর খরচ তাঁহারা চালাইবেন। তাঁহারা তাঁহাকে নিজ ব্যয়ের জন্যও বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড উঠাইয়া দিতে চাহেন। এ সকল ব্যবস্থাতেই, গান্ধীজীর প্রতি ভারতীয়দের গভীর প্রেম ও আস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি জীবিকার জন্য ব্যারিস্টারী করিয়া, সেবার জন্য সমস্ত সময়ই দিতে চাহেন। ভারতীয়েরা তাঁহাদের মোকদ্দমা তাঁহার হাতে দিলে, এ কাজ কঠিন নয়। এই ব্যবস্থায় গান্ধীজী রহিয়া গেলেন। তিনি ডারবানে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে নাতালের ভারতীয়দের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি প্রায় সকলেরই পরিচিত হন ও মজুরদের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ভারতবর্ষ হইতে এগ্রিমেণ্ট করিয়া মজুর লওয়া হইত। তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করা হইত। একবারকার এগ্রিমেণ্ট শেষ হইলে, পুনরায় এগ্রিমেণ্ট করিলেই থাকিতে দিবে, নচেৎ দিবে না ; এইজন্য, যাহারা থাকিবে তাহাদের উপর বার্ষিক ২৫ পাউণ্ড করিয়া কর বসাইবার চেষ্টা হয়। গান্ধীজী কংগ্রেস হইতে আন্দোলন করিতে থাকিলে, উহা কমাইয়া বার্ষিক ৩ পাউণ্ড করা হয়। স্বামী-স্ত্রী ছেলে-পিলে সকলের উপরই কর ধরা হয়, অর্থাৎ যদি একটি পরিবারে একজন পুরুষ উপার্জন-ক্ষম হয়, তবে তাহার উপর, পরিবারে আর চারজন লোক থাকিলে, গড়ে বার্ষিক ১৮০৲ টাকা ট্যাক্স চাপানো হয়। কংগ্রেস এই

বিষয় লইয়া আন্দোলন ও পরে সত্যাগ্রহ করেন। কুড়ি বৎসর, ১৮৯৪ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া তবে সত্যাগ্রহ দ্বারা এই পাপ তিনি দূর করেন। তিনি এই সকল ভারতীয়ের সেবার ভিতর দিয়া ধর্মের স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন, আর যখনই সময় পাইতেন ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। তিনি এখন হইতে জন-সেবার কার্য আত্মদর্শনের অভিলাষ হইতে করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া, উহাতে ওতপ্রোত হইয়া যান। এই সময়ে আফ্রিকান মিশনের কর্তা মিঃ স্পেনসর ওয়ালটন গান্ধীজীকে খুঁজিয়া লন এবং তিনি ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের উন্নত সংসর্গ ও প্রেম দান করেন। এদিকে ছিলেন বোম্বাইয়ের রায়চাঁদভাই, যাঁহাকে বিলাত হইতে আসিয়াই তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম সঙ্গী স্বরূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্র ও প্রেরিত পুস্তকাদি হইতে হিন্দুধর্মের প্রতি গান্ধীজীর আস্থা গাঢ় হইয়া পড়ে। টলষ্টয়ের পুস্তক ও আদর্শের সহিত তাঁহার এই সময় পরিচয় ঘটে এবং উহা তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়। তিন বৎসর পরে ১৮৯৬ সালে, তিনি পরিবার লইয়া যাইতে পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন।

ভারতে ছয় মাস

ভারতে আসিয়াই দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে লাগিয়া যান। ষ্টীমার হইতে কলিকাতায় নামিয়া বোম্বাই যাওয়ার পথে, এলাহাবাদে গিয়া ট্রেন হইতে নামার পর, একটা ঔষধ কিনিয়া আনিতে বিলম্ব হওয়ায় ট্রেন ধরিতে পারেন না। সেইদিন এলাহাবাদে থাকিতে হয়। যদি থাকাই হইল, তবে আর দিনটার সদ্ব্যবহার না করিবেন কেন? তিনি সেখানে 'পাইওনিয়ার' আফিসে গিয়া সম্পাদকের সহিত দেখা করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের দুর্গতির কথা বলেন ও ভারতের জনমত গঠনের জন্য সম্পাদককে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। সম্পাদক বলেন যে, ঔপনিবেশিকের স্বার্থের হানিকর নয় এমন যাহা লেখা গান্ধীজী পাঠাইবেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিবেন ও আবশ্যকমত আলোচনা করিবেন। অতঃপর গান্ধীজীর বক্তব্য 'পাইওনিয়ারে' বাহির হয় ও তাহার মর্ম এখানকার তারের খবর-দাতা বিলাতে তার করিয়া পাঠায়।

গান্ধীজী রাজকোটে যান এবং সেখানে বসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া দেশময় বিতরণ করেন। তাহার পর সভা করার জন্য

বাহির হইয়া পড়েন। বোম্বাইয়ে সার ফিরোজশা মেহতা ও ওয়াচাজীর খুব সাহায্য ও সহানুভূতি পান এবং সেখানে বেশ ভাল সভা হয়। পুনায় গিয়া তাঁহার পরম লাভ হয় গোখলেজীর দর্শন। লোকমান্যের সঙ্গেও তাঁহার এই প্রথম পরিচয়। পুনায় দুইটি রাজনৈতিক দল ছিল। এই দুই দলের একত্র সম্মিলনে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক জনসভা হয়। খুব ভাল সভাই হইয়াছিল। তারপর মাদ্রাজে গান্ধীজীকে কি বিপুল অভ্যর্থনা করা হয়! দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক মাদ্রাজী গিরমিটিয়া (এগ্রিমেণ্ট-বদ্ধ মজুর) মজুর আছে। তাহাদিগকে গান্ধীজী কি ভাবে সেবা করেন—তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, সে কথা মাদ্রাজে রটিয়াছিল। সেইজন্য গান্ধীজীকে দেখিতে মাদ্রাজ উন্মত্ত-প্রায় হইল। সেখানে খুব বড় সভা হয়। সংবাদপত্রের যতদূর সাহায্য পাওয়ার, সে সমস্তই তিনি পান ও অনেক মিত্র লাভ করেন।

গান্ধীজী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যানের' নিকট হইতে সহানুভূতি পান। 'ইংলিশম্যান' পত্র ত তাঁহার কার্যের খুবই সহায়তা করিতে থাকে। কলিকাতায় সভা সংঘটিত করা সহজ হয় নাই। তিনি এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করিয়াছেন, নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তেমন আগ্রহ পান নাই। দেশীয় সংবাদপত্রের নিকট হইতে তিনি অবজ্ঞাই প্রাপ্ত হন। তিনি যখন একটা সভা ডাকার জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছিলেন, তখন আফ্রিকাতে ফিরিয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রাম আসে।

ডারবানে (নাতালে) ৫ বৎসর

গান্ধীজী ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর জাহাজ 'কুরল্যাণ্ডে' সপরিবারে যাত্রা করেন। ঐ সঙ্গে এক দিনেই দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর আর একখানা জাহাজ 'নাদেরী'ও রওয়ানা হয়। দুইখানা জাহাজেই দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রী বোঝাই ছিল। এই সংবাদ নাতালে গিয়া পঁহুছিলে, সেখানে বড় চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্বে 'পাইওনিয়ার', দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে গান্ধীজীর বক্তব্যের যে বিবরণ বাহির করিয়াছিল, তাহার একটা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত বিবরন ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তারযোগে যায়। সেখানকার ইংরেজ বাসিন্দারা আগুন হইয়া উঠে, তারপর

এই জাহাজ বোঝাই লোক আসিতেছে শুনিয়া, তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হয়। বস্তুতঃ গভর্নমেণ্টই পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে জনসমূহকে উস্কাইতেছিল। ফলে, জাহাজ দুইখানা উপস্থিত হইলে, ৩২ দিন পরে উহাদিগকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। জাহাজের সমস্ত যাত্রীকে প্রথমে মারিবার ও জলে ফেলিয়া দেওয়ার ভয় দেখানো হইতেছিল, কিন্তু নামার সময় আর কিছু করে না। গভর্নমেণ্ট, দাদা আবদুল্লা কোম্পানীকে দমাইতে না পারিয়া যাত্রী নামাইতে দেন। গান্ধীজী নামিলে তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং খুবই মারে। সেখানকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী সেই সময় সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আসিয়া ছাতার আড়াল দিয়া গান্ধীজীকে রক্ষা করেন। তিনি গান্ধীজীকে চিনিতেন। ইতোমধ্যে পুলিস আসিয়া গান্ধীজীকে রক্ষা করিয়া একজন মিত্রের বাড়িতে পঁহুছাইয়া দেয়। সেইখানেই সে রাত্র থাকার কথা ছিল। গান্ধীজীকে পুলিস সাহেব থানায় আশ্রয় নিতে বলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাহা শুনেন না, তিনি বলেন যে, তাঁহার ডারবানের লোকের ন্যায়পরতার উপর বিশ্বাস আছে। এদিকে সন্ধ্যা হইতেই গান্ধীজীর বাড়ি ঘিরিয়া হাজার হাজার লোক একত্র হইয়া গান্ধীজীকে খুন করিবে বলিয়া দাবি করে, নচেৎ বাড়িশুদ্ধ পোড়াইয়া মারিবে বলিয়া শাসাইতে থাকে। এই উন্মত্ত জনতার মধ্য হইতে, ছদ্মবেশ পরাইয়া পুলিস সাহেব তাঁহাকে লুকাইয়া বাহির করিয়া লইয়া অন্যত্র রাখিয়া, জনতাকে সে কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেন।

এই সকল ব্যাপারে গান্ধীজীর কোন দোষ ছিল না। আবার তাঁহার আক্রমণকারীদিগকে তিনি চিনিলেও, তাহাদের নামে নালিশ করিতে রাজি হন না। এই সকল কারণে, যে সকল সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ লোক এই হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল, তাহারা নিজেরাই লজ্জিত হয় এবং গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠা বাড়ে।

গান্ধীজী ফিরিয়া গিয়া কংগ্রেসের কাজ ও ভারতীয়দের সেবার কাজ জোরে চালাইতে থাকেন। সেখানকার ভারতবাসীর অবস্থা কুকুর বিড়ালেরও অধম ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য, ব্যবহার মনুষ্যোচিত করার জন্য, তিনি কাউন্সিলের ভিতর দিয়া ও বাহিরে, জনমত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৯৭ হইতে ১৯০১ এই পাঁচটা বৎসর এইভাবে কাটে। ইহার মধ্যে

বুয়ার-যুদ্ধ ঘটে। রাজার প্রতি তাঁহার দায়িত্ব-জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, তিনি অহিংসার উপাসক হওয়া সত্ত্বেও উপযাচক হইয়া সৈন্যগণের সেবাকার্য করার জন্য প্রস্তুত হন। অহিংস-ব্রতী কেমন করিয়া একাজ করিতে পারে, সে কথা পরবর্তী কালে, ১৯১৪ সালে যখন তিনি ইউরোপীয় যুদ্ধে সাহায্য করিতে নামেন, সেই ঘটনার উল্লেখ কালে লিখিব। এই সময় ডুলি কাঁধে লইয়া তিনি ২০।২৫ মাইল চলিতেন। যে সকল নাতালবাসী ইংরেজ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার এই সেবা-কার্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। সাধারণ সৈন্যরাও ভারতীয়দের সহিত মিত্রভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করে।

সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গান্ধীজী যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই তাঁহার জীবন-যাত্রা সরল হইয়া আসিতেছিল। বাড়িতে, যতটা পারা যায়, নিজের কাজ নিজেই করিয়া লইতেন। কাপড়ও নিজে কাচিয়া ইস্তিরি করিয়া লইতেন। এই সময় সন্তান-পালন ও শিক্ষা দেওয়ার কার্যেও তাঁহাকে মন দিতে হয়। ছোট ছেলেকে পালন করিতে যাইয়া, তিনি এ বিষয়ে নিপুণ হন। বড় ছেলেদিগকে সেখানে স্কুলে দেওয়ার সুবিধা ছিল না। সেইজন্য তাহারা ঘরেই পড়িত। তাহাদিগকে আফিসে যাওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতে তাহারা কথোপকথনে কিছু কিছু শিখিত। নিজে বিশেষ করিয়া সময় না দিতে পারিলেও, পিতামাতার সহিত বাস করায় ও তাঁহাদিগকে সাহায্য করায় যে শিক্ষা, তাহাই তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা মনে করিতেন। পুঁথি-পড়া বিদ্যার মূল্য আছে, কিন্তু সে মূল্য কম এবং তাহা ভাল করিয়া ছেলেদিগকে দিতে না পারায় তাঁহার ক্ষোভ হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার স্কুলে ইংরেজীতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলগুলি মিশনারী দ্বারা চালিত, মিশনারীরা আবার সরকার দ্বারা চালিত। কাজেই সেখানকার শিক্ষা দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে দেওয়া হয়। যে সরকার ভারতীয়দিগকে সংকল্প করিয়া তাচ্ছিল্য করে, সে সরকার ভারতীয়দিগকে দাসত্ব ছাড়া আর কি শিক্ষা দিবে! গান্ধীজী আত্ম-জীবনীতে বলেন—"স্বাধীনতা-দেবীর উপাসক দেখিতে পাইবেন, দেবী সেবককে কি দুর্ভোগ দিয়া থাকেন। * * * যদি আমি ছেলেদিগকে আমার কাছে রাখিয়াও আত্মসম্মান বলি দিতাম, যদি অপর ভারতীয়েরা যে শিক্ষা ছেলেদিগকে দিতে পারে না, সে শিক্ষা আমার ছেলেদিগকে দিতে আমার

প্রবৃত্তি হইত, তবে আমার ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে, তাহারা যে আত্মমর্যাদার ও স্বাধীনতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা পাইত না। যেখানে স্বাধীনতা ও পুঁথি-পড়া বিদ্যার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয়, সেখানে কেহ বা না বলিবে যে, স্বাধীনতা পুঁথির বিদ্যা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ!"

"যে সকল যুবককে আমি ১৯২০ সালে স্বাধীনতার পরিপন্থী স্কুল ও কলেজ ছাড়িতে বলিয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, স্বাধীনতার জন্য নিরক্ষর থাকিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় পাথর ভাঙ্গাও গোলামির ভিতর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করা অপেক্ষা ভাল, তাঁহারা আজ হয়ত দেখিতে পারিবেন যে, আমার কথার মূল কোথায়।"

গান্ধীজী নিজে আচরণ না করিয়া পরকে কখনও উপদেশ দেন না। স্কুল ও কলেজে নিজের ছেলেকে সেইজন্যই পাঠান নাই। তাঁহার বড় ছেলে আহমেদাবাদে পড়িতেছিল। গান্ধীজী তাহাকে আফ্রিকায় লইয়া যান। সে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় স্ব-ইচ্ছায় আহমেদাবাদেই ফিরিয়া পড়িতে যায়।

গান্ধীজী এই সময় মাটি ও জল-চিকিৎসার প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকেন। তিনি অনেক দিন পরীক্ষা করিয়া, পরে একখানা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন ও উহাতে স্বাভাবিক চিকিৎসার রীতি বুঝাইয়াছেন। *

ভারতীয়দের অধিকারের জন্য যেমন তিনি সরকারের নিকট দাবি করিতে থাকেন, তেমনি ভিতর হইতেও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। ডারবানে মড়কের ভয় উপস্থিত হইলে, তিনি ভারতীয়দিগকে ঘর সাফাই করিতে প্ররোচিত করেন। ইহাতে সকল পক্ষেরই সুবিধা হইয়াছিল।

ভারতে দুর্ভিক্ষ হইলে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে চাঁদা তুলিয়া দুইবারে অনেক টাকা পাঠানো হইয়াছিল।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় পয়সা উপার্জন করিতে থাকিয়া, তাহার সহিত সেবা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। তাঁহার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল এবং তাঁহার কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষেই, এইরূপ তাঁহার মনে হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কংগ্রেসের কাজ ভালই চলিতেছিল।

---

* 'স্বাস্থ্যরক্ষা' খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।

তিনি গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তাঁহার আফ্রিকার বন্ধুরা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। তাঁহারা এই সর্তে তাঁহাকে মুক্তি দেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ডাকিলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। গান্ধীজী ভারতে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে ডাক আসে, আবার ১৯০১ সালেই ফিরিয়া যাইতে হয়। ভারতে আসিবার কালে ১৮৯৬ সালে ও ১৯০১ সালে, মিত্রদিগের নিকট হইতে যে সকল মূল্যবান বিদায়-উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা কতকটা দাম্পত্য কলহ সহ্য করিয়াও, দেশ-সেবার জন্য ট্রাস্ট করিয়া দিয়া আসেন।

১৯০১ সালে ভারতে কয়েক মাস

দক্ষিণ আফ্রিকার মায়া কাটাইয়া, তিনি সেবা করার জন্য ভারতবর্ষে আসেন। এখানে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ঘটনা ঘটে। সে বার কংগ্রেস কলিকাতায় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া তিনি অনেক কার্য করিয়াছিলেন, ভারতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিনিধি দেখিয়া তাঁহার মন উঠে না। যে সেবাভাব দেখার জন্য তিনি লালায়িত, তাহার অভাব ও তাহা শিক্ষা দেওয়ারও অভাব, তিনি দেখিতে পান। তখন কংগ্রেসে সমস্ত প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইত। কংগ্রেসের পর কিছুদিন কলিকাতা ও ব্রহ্মদেশে পরিচয়ের জন্য কাটাইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে ভারত-ভ্রমণ করিতে বাহির হন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বোম্বাই অসিয়া বসেন। বোম্বাই হাইকোর্টে এবার উপার্জনের কোনও ভাবনা ছিল না। কেননা, যাহারা তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় জানিত, তাহাদের কেহ কেহ বোম্বাইএ ছিল। তাহাদের মোকদ্দমার সংখ্যাই এত ছিল যে, উহাই গান্ধীজীর আবশ্যক মিটিবার পক্ষে যথেষ্ট। কয়েকমাস বোম্বাইএ ব্যারিস্টারী করেন, এদিকে মহামতি গোখলের সহিত যুক্ত হইয়া রাজনৈতিক কার্য করার ব্যবস্থা হইতে থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তার আসে যে, শীঘ্র চলিয়া আসুন। তার পাইয়া, প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি ব্যবসা ফেলিয়া ও পরিবার ফেলিয়া আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। আশা ছিল, অল্পদিনেই কাজ মিটাইয়া ফিরিবেন, সেইজন্য বোম্বাইয়ের বাড়ি ছাড়েন না। কিন্তু যে কাজে গিয়া পড়িলেন, তাহা মিটাইতে চৌদ্দ বৎসর লাগে। বিধাতা গান্ধীজীকে দিয়া

যে মুক্তি-যুদ্ধ চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন, তজ্জন্য বিধাতা যে নতুন অস্ত্র গান্ধীজীকে দিবেন, তাহা দেওয়ার সময় তখনও আসে নাই, সে ক্ষেত্রও বোম্বাই নহে। কাজেই ভারতের সেবা করিতে ইচ্ছা করিলে কি হইবে? বিধাতা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া, পীড়িত অপমানিত দুর্বল জন-সমুদ্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে ফেলিয়া, প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে সন্ধান কেমন করিয়া গান্ধীজী পাইলেন, পরে বলিতেছি।

১৯০১—১৯০৬ সাল
ট্রান্সভাল—জোহানেসবর্গে

এবার যে ডাক পড়িয়াছিল তাহার হেতু এই যে, বিলাত হইতে মিঃ চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আবশ্যকীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অবস্থা জানিতে সেখানে আসিতেছিলেন। গান্ধীজীকে দিয়া, ভারতীয়দের অভাব, অভিযোগ ও দাবির কথা তাঁহার নিকট উপস্থিত করাইবার জন্যই গান্ধীজীকে আহ্বান করা হয়। গান্ধীজী ডারবানে (নাতালে) মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করিয়া নাতালবাসীর দুরবস্থার কথা জানান। তারপর, ট্রান্সভাল-বাসীদের পক্ষ হইতে দুর্দশার কথা জানাইবার জন্য তাঁহার প্রিটোরিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ভারতবাসীরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারে না। চেষ্টা করিয়া গান্ধীজী সেখানে যান, কিন্তু স্থানীয় কর্তারা বলেন যে, তাঁহাকে ভারতীয়দের পক্ষ হইয়া মিঃ চেম্বারলেনের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ দেখা করিতে দেওয়াও হয় না। ট্রান্সভালে গান্ধীজীর কাজ তাহাতে শেষ হয় ও তিনি ফিরিয়া আসিলে তখন আসিতে পারিতেন। কিন্তু ট্রান্সভালে ভারতবাসীর বড়ই দুর্দশা দেখেন ও তিনি চেষ্টা করিলে কতকটা দুঃখের লাঘব করিতে পারিবেন এই বিশ্বাস হওয়ায়, তিনি জোহানেসবর্গে ব্যারিস্টারী করিতে বসিয়া যান। জোহানেসবর্গে অনেক ভারতবাসী থাকিত। তাহাদের সহিত উকিল হিসাবে ও পরামর্শ-দাতা হিসাবে তাঁহার নিকট-সম্পর্ক সৃষ্ট হয়। তাঁহার ব্যবসাও খুব ভাল চলিতে থাকে। জোহানেসবর্গে যে স্থানে ভারতীয়েরা নিজেরা জমি কিনিয়া বাস করিত, তাহা শহর হইতে দূরে, আমাদের অস্পৃশ্যপাড়ার মত। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে, এই স্থান হইতে তাহাদিগকে গভর্নমেণ্ট তুলিয়া দিবেন

বলিয়া আইন পাস করেন। মিউনিসিপালিটি হইতে ক্ষতিপূরণ দিয়া উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ক্ষতিপূরণের টাকা ঠিকমত পাওয়ার জন্য ভারতীয়দের নালিশ করিতে হয়। এই কার্য গান্ধীজীর দ্বারাই তাহারা করিতে থাকে। গান্ধীজী কম টাকা লইলেও, কাজ এত বেশি ছিল যে, এই মোকদ্দমাতে তাঁহার অনেক টাকা আয় হয়। আফিসে অন্য সাহেব বন্ধু সহকর্মীরূপে গ্রহণ করেন। ইউরোপীয় মহিলা টাইপিষ্ট রাখিতে হয়, ৪।৫ জন কেরানীতেও কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তিনি উন্নতি করিতেছিলেন ও সততার জন্য অন্য উকিল ও মক্কেলদিগের শ্রদ্ধা পাইতেছিলেন। এদিকে ভারতীয়দের জন্য সার্বজনীন কার্যেও তিনি বেশ অগ্রসর হইতেছিলেন। ট্রান্সভালেও তিনি কংগ্রেস স্থাপিত করিয়া, তাহার সাহায্যে সকল ভারতীয়কে একত্র করিয়া কার্য করিতেছিলেন। এদিকে নাতালে একটা ছাপাখানার স্বত্বাধিকার তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে ও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে কাগজখানা ১৯০৪ সালে বাহির করেন। কাগজখানা আজও চলিতেছে। ঐ কাগজের সাহায্যে গান্ধীজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহার ভাবে ভারতীয়দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। কাগজখানার জন্য কিছুকাল মাসিক হাজারবারশত টাকা করিয়া লোকসান দিতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি যাহা রোজগার করিতেন, বাড়ির খরচ বাদে আর সমস্তটাই এই কাগজের পিছনে যাইত।

ব্যারিস্টারী কর্ম ও সমাজ সেবার কর্মের ভিতর দিয়া তিনি যেমন নানা জাতির লোকের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত হইয়া পড়েন, তেমনি তাঁহার বাড়িতেও, দেশী ও ইউরোপীয় লোকের সহিত এক পরিবারের মত বাস করিতে থাকেন। নিরামিষ ভোজনকে কেন্দ্র করিয়া বিলাতে তাঁহার জীবনে যেমন কতকগুলি বিশেষ ঘটনা ঘটে, এইখানেও সেই প্রকার হয়। একজন জার্মান মহিলা একটা ভোজনালয় খোলেন। গান্ধীজী সেই স্থানে আহার করিতে যাইতেন। তাঁহার কারবার ভাল করিয়া চালাইবার জন্য, তিনি গান্ধীজীর নিকট ঋণ চাহেন। গান্ধীজীর নিজের টাকা ছিল না, এক মক্কেলের গচ্ছিত টাকা হইতে ১৫০০০৲ টাকা, মক্কেলের অনুমতি অনুসারে ঋণ দেন। এই পনের হাজার টাকাই ডুবিয়া যায়। গান্ধীজী নিজ উপার্জন হইতে এই টাকা পূরণ করেন। ইহাতে তাঁহার খুব শিক্ষা হয়। অন্য এক নিরামিষ ভোজনালয়ে তাঁহার মিঃ ওয়েষ্টের সহিত পরিচয় হয়। ওয়েষ্ট তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন

ও গান্ধীজীর অনুরোধক্রমে ডারবানে গিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রেসের কার্যভার লন। গান্ধীজী যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, অর্থাৎ ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত, ওয়েষ্ট সপরিবারে গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। তারপর সেই ভোজনাগারেই, মিঃ পোলক তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করেন। মিঃ পোলক ছিলেন একখানা সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক। ঐ কার্যে ইস্তফা দিয়া, তিনিও গান্ধীজীর সহকর্মী হইয়া তাঁহার পরিবারভুক্ত হন ও শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন। মিঃ কলেনবেক নামে আর একজন জার্মানও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার সহকর্মী হন ও পরিবারভুক্ত হইয়া পড়েন। কলেনবেক একক ছিলেন। তাঁহার উপার্জন ছিল প্রভূত। তিনি কেবল নিজের জন্য, মাসিক ১২০০৲ টাকা বাড়িভাড়া বাদে ব্যয় করিতেন। সেই ব্যক্তি গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসিয়া, মাসিক খরচ ১২০৲ টাকায় আনিয়া ফেলেন এবং তারপর ত ফকিরের মত থাকিতেই অভ্যস্ত হন।

১৯০৪ সালের কথা। মিঃ ওয়েষ্ট তখন ডারবানে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ছাপাখানার ভার লইয়াছেন। কার্যভার হাতে লইয়াই, ঐ প্রেসে যে বিপুল লোকসান চলিতেছিল তাহা গান্ধীজীকে জানান। গান্ধীজী সেজন্য ডারবানে উহা দেখিতে যান। তখন কেবল মিঃ পোলকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। মিঃ পোলক তাঁহাকে ট্রেনে পড়িবার জন্য একখানা বই দেন—রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট"। এই বইখানা ছিল শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, মানুষে মানুষে সমভাব রক্ষা করার ও সকলেরই উপার্জন একরকম হওয়ার সম্বন্ধে। উকিলের রোজগার আর নাপিতের রোজগার একই রকম হওয়া উচিত, আদর্শ মানব-জীবন ত চাষারই জীবন—এই দুইটি ভাব এই মূলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, সকলের যাহাতে ভাল আমার সত্যিকার ভাল তাহাতেই। এই বহিখানি তিনি সারা রাস্তায় পড়িয়া মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পথ কোথায় দিয়া কাটিয়া গেল। ২৪ ঘণ্টা রেল-ভ্রমণ। জোহানেসবর্গ হইতে ডারবানে ৩০০ মাইল যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগিত। পরদিন সন্ধ্যায় ডারবানে পঁহুছিয়া, রাত্রি এই নতুন ভাবনায় বিনিদ্র ভাবে কাটাইলেন এবং প্রত্যূষে উঠিয়াই সংকল্প করিলেন যে, সকলে একই মত উপার্জন করিয়া ও হাতের কাজ করিয়া খাটিয়া খাওয়ার একটা স্থান ও কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবেন। যেমন সংকল্প করা তেমনি তাহা কার্যে পরিণত করা। তখনই চেষ্টা করিয়া ডারবান হইতে অল্প দূরে ফিনিক্স স্টেশনের নিকট ফিনিক্স নামে বাগান, জমি ও তাহার সংলগ্ন

আরও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া সেখানে ঘর উঠাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ছাপাখানা সেখানে স্থানান্তরিত করিয়া জীবনযাত্রা সরলভাবে ও আদর্শ অনুযায়ী আরম্ভ করিয়া দিয়া জোহানেসবর্গে চলিয়া আসিলেন। আফিসের কাজের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজেও গিয়া বসিবেন এই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বছর দুইয়ের মধ্যে তাহা আর হয় নাই। আফিস ছাড়িবার চেষ্টায় তিনি উহাতে আরো জড়াইয়া পড়িতেছিলেন। কাজ বাড়িয়া যাইতেছিল, লোকও বাড়িয়া যাইতেছিল।

রাস্কিনের বহির এত প্রভাব হওয়ার হেতু এই যে, গান্ধীজীর অন্তরাত্মা যাহা চাহিতেছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব এই বহিখানাতে তিনি দেখিতে পান। এই সময় তিনি ধর্মের আবেষ্টনে সর্বপ্রকারে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসের প্রথম বৎসরে যেমন তিনি খ্রীষ্ট-ধর্মীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন ও সেই উপলক্ষে ইউরোপীয়দিগের সহিত স্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হইতেছিলেন, এখানে এবার তেমনি থিয়োসফিস্ট-সমাজ তাঁহার ধর্ম-পিপাসা আরো জাগ্রত, বর্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতেছিল। থিয়োসফিস্টরা হিন্দুধর্মের প্রতি বড়ই সহানুভূতি-পরায়ণ। গান্ধীজী ইঁহাদিগের সহিত হিন্দুধর্ম-পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন, গীতা রাজযোগ ইত্যাদি পড়েন ও গীতার অর্থের গভীরতর অনুভূতি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার পথ প্রদর্শক রায়চন্দ ভাই। গান্ধীজীর সংশয়ের সময় তিনি তাঁহাকে জানান যে, হিন্দুধর্মে যতই গভীরভাবে প্রবেশ করা যাইবে, ততই উহা তৃপ্তিদায়ক হইবে এবং তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে উদারতা ও তৃপ্তি অন্য ধর্মে তিনি পান নাই।

গান্ধীজীর ধর্ম-জিজ্ঞাসা বাস্তব প্রশ্নে প্রকট হয়। সমবুদ্ধি কাহাকে বলে? কেমন করিয়া উহা শিক্ষা করিব ও পালন করিব? যে অপমান করে, যে চোর বা জুয়াচোর, যে পুরাতন বন্ধু, আর যে পরম হিতার্থী—ইহাদের মধ্যে কি ভেদ নাই? অপরিগ্রহ কেমন করিয়া পালন করিব? স্ত্রী-পুত্র ও এই দেহও কি পরিগ্রহ নয়? এই সকল প্রশ্ন উঠিতে লাগিল ও তাহার সমাধান-কল্পে জীবনযাত্রার পরিবর্তন চলিতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্রের কি হইবে এই আশঙ্কা করিয়া জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, এখন উহার প্রিমিয়াম বন্ধ করিয়া দিলেন। যিনি কোটি কোটি দরিদ্রের পালন-কর্তা, তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে কি পালন করিবেন না? কয়জন বীমা করিতে পারে? বাকি সকলের যে

অবস্থা তাঁহারও সেই অবস্থা হোক। দেশে টাকা পাঠাইতেন, তাহা পাঠানো বন্ধ করিয়া, সমস্তটাই স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিলেন।

সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছিল। সেবা নতুন নতুন রূপ ধারণ করিতেছিল এবং এক পরিচিত ক্ষেত্র হইতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিতেছিল। ১৯০৪ সালেই জোহানেসবর্গে ভারতীয় বস্তিতে কালো প্লেগ দেখা দেয়। সহায়ক, উদ্ধারক ও বুদ্ধিদাতা হিসাবে তখন গান্ধীজীই তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া গিয়া দাঁড়ান। এই ভয়ানক রোগে, ২৪ ঘণ্টায় ২৩ জন আক্রান্তের ভিতর ২১ জন মারা যায়। কিন্তু গান্ধীজীর সেবা-কুশলতা ও অন্যান্য শুভ সংযোগ বশতঃ ইহা আর বাড়িতে পারে নাই। শুশ্রূষাকারীদেরও বিপদের ভয় ছিল কিন্তু গান্ধীজীর দলের কিছু হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে একজন ইংরেজ নার্স আক্রান্ত হইয়া মারা যান।

ধর্মজীবনে যে সংযম আবশ্যক, তাহার সহিত খাদ্যাখাদ্য বিচারের প্রয়োজনীয়তা এখন তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। তিনি খাদ্য সরল করিতে আরম্ভ করেন। লবণ ও ডাল ত্যাগ করেন। অবশেষে কেবল ফলাহার করিয়াই দীর্ঘ দিন কাটান। দুধও ত্যাগ করেন। ইহার প্রথম কারণ—গাভীকে কষ্ট দিয়া গোয়ালারা দোহন করে, দ্বিতীয় কারণ—দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নহে, তৃতীয় কারণ—দুধ দ্বারা মানসিক বিকার হয়, যাহা ফলের আহার দ্বারা হয় না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উপবাসের মহত্ত্ব তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, এখন ধর্মের দিক দিয়াও উহার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান।

গান্ধীজীকে আমরা ১৯০৬ সালে যে রূপে দেখিয়াছি তাহা এই। তিনি বড় ব্যারিস্টার হইয়া প্রচুর উপার্জন করিতেছেন। তাঁহার আশে পাশে সাহেব ও মেম সহকারী কর্মী, দেশী লোক ত রহিয়াছেই। এই হইতেছে ব্যারিস্টার গান্ধীর রূপ। আর এক দিকে তিনি সেবা-পরায়ণ গান্ধী। মাটি ও জলের চিকিৎসায় বিশ্বাস করিয়া তিনি ডাক্তার হইয়া বসিয়াছেন। মক্কেলদের পীড়ায় ও অন্য ভারতীয়দের রোগে শুশ্রূষা, সেবা ও চিকিৎসা করিতেছেন—ছোঁয়াচে রোগে নিজ হাতে সেবা করিতেছেন। ভাল করিয়া সেবা করিবার জন্য, ডাক্তার বুথের দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়া কম্পাউণ্ডারী ও শুশ্রূষাকারীর কার্যের তালিম দিতেছেন। তাহাতে সময় আবশ্যক, সুতরাং

আর একজন ইউরোপীয় সহকর্মী আফিসে বসাইয়া আরো কিছু সময় বাহির করিয়া লইতেছেন।

তারপর রাজনৈতিক গান্ধী। কংগ্রেস বসাইয়া তিনি সকল ভারতীয়কে একত্র করিতেছেন, শিক্ষা সমিতি বসাইয়া ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়া, অধিকার পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে লইয়া সরকারের সহিত বোঝাপড়া করিতেছেন, কাউন্সিলে প্রশ্ন করিতেছেন, অন্যায় আইনের প্রতিকারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে জনশক্তি সহ বিরোধ করিতেছেন।

গৃহকর্তা গান্ধী বাড়ির চালচলন ভারতীয় করিয়া ফেলিয়াছেন—পরিবারের ইউরোপীয়েরাও ভারতীয় চালচলন লইয়াছেন। বাড়িতে গম পেষাই করিতেছেন, নিজে ধোপাগিরি করিয়া কলার ইস্তিরি করিয়া কোর্টে যাইতেছেন।

কৃষক গান্ধী ফিনিক্সে আদর্শ কৃষক-মণ্ডলী সৃষ্টি করিতেছেন। চাষা হইলে ত খাটিয়া খাইতে কাহারও বাধা নাই। তাই যুবক অবিবাহিত ইংরেজ মিত্রদিগকে ও নিজের কুটুম্বদিগকে, বিবাহ করিয়া ফিনিক্স গ্রামে স্ত্রী-পরিজন লইয়া চাষা হইয়া বসিয়া যাইতে প্ররোচিত করিতেছেন।

সংযমী গান্ধী আহারে সংযম করিতেছেন। উপবাস করিতেছেন। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে সংযম আনিয়া, উহার পবিত্রতার আস্বাদ পাইতেছেন। বাক্যে সংযম অভ্যাস করিতেছেন।

সম্পাদক গান্ধী 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' জন্য লিখিতেছেন কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ বিচার করিয়া ওজন করিয়া লিখিতেছেন। সে বিচার এমনি যে, আজ তিনি বলিতে পারিতেছেন যে, ১০ বৎসর ধরিয়া, তিনি জেলের বাহিরে থাকা কালীন প্রতি সপ্তাহেই লিখিয়াছেন, কিন্তু এই কাল মধ্যে একটি বারও ইচ্ছা করিয়া অতিরঞ্জন করেন নাই, একটা শব্দ বিনা বিচারে লিখেন নাই, একটা অনাবশ্যক বিশেষণ প্রয়োগ করেন নাই।

স্বদেশ প্রেমিক গান্ধী, স্কুলে ছেলেদিগকে দেশী ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্কুলে দেওয়াই বন্ধ করিয়াছেন। সকল ভারতীয় ছেলেকে স্কুলে পড়ানো সম্ভব নহে বলিয়া, নিজের ছেলেকেও স্কুলে দিতেছেন না। না হয় স্কুলের শিক্ষা নাই হইল। ছেলেদের সহিত

গুজরাটীতেই কথা বলিয়া, তাহাদিগকে গুজরাটী করিয়া রাখিতেছেন। পরিবারস্থ সাহেবেরা বিরোধ করিলেও শুনিতেছেন না।

বিধাতা গান্ধীজীকে এই সময়ের মধ্যে অপূর্ব শক্তিতে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অপার সেবাবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছেন।

১৯০৬—১৯১৪

ব্রহ্মচর্য ও সত্যাগ্রহ

কিন্তু এখনো কিছু বাকি ছিল। ব্রহ্মচর্যের পুরাপুরি আস্বাদ গান্ধীজী এখনো পান নাই, ব্রহ্মচর্যের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। বিধাতা সে সুযোগ এইভাবে উপস্থিত করিলেন। নাতালে জুলু বলিয়া নিগ্রো জাতি আছে। নাতাল সরকার বলেন যে, জুলুরা বিদ্রোহ করিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। গান্ধীজী এখন ট্রান্সভালে থাকিলেও, নিজেকে নাতালবাসীই মনে করিতেন। ফিনিক্সও নাতালেই অবস্থিত। তিনি নাতাল সরকারকে সাহায্য করার জন্য এই যুদ্ধে আহতদের সেবার কার্য করিতে ইচ্ছা করেন। সরকারের সম্মতি পাইয়া তিনি তখনই জোহানেসবর্গের বাড়ি তুলিয়া দেন, পরিবার ফিনিক্সে পাঠাইয়া দিয়া, ডারবানে ছোট একটা দল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে বাহির হইয়া পড়েন। গিয়া দেখেন যে, উহা যুদ্ধ বা বিদ্রোহ-দমন নয়, কেবল নিরেট নরহত্যা। তিনি গিয়া দেখেন যে, কতকগুলি নিগ্রোর ঘা পচিয়া উঠিয়াছে। বিপক্ষে যাইতে পারে এই আশঙ্কায়, উহাদিগকে চাবুক মারা হইয়াছিল। সেই চাবুকের ঘা পাকিয়া, পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে—কাছে যাওয়া যায় না। আর এদিকে ইংরেজ শুশ্রূষাকারীদলও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। গান্ধীজী এই অবস্থায় প্রভূত সেবা করার অবকাশ পাইয়াছিলেন বলিয়া সন্তোষ লাভ করেন। এই সময় তাঁহাকে আহত লোক লইয়া রোজ ২০।২৫ মাইল চলিতে হইত। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—মাঝে মাঝে দুই একটা পাহাড়, দুই একটা জুলুদের বস্তি আর কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত শূন্য। এই পথ কখনো বা আহত লইয়া, কখনো বা অমনি হাটিতে হাটিতে, গান্ধীজীর মন উধাও হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণে লীন হইয়া যাইত। ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্রহ্মচর্য যে না হইলেই চলে না, তাহা তখনো গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ হয় নাই। তবে সেবার জন্য যে উহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইল। "আমার নিকট ত এই রকম সেবার অবকাশ

ক্রমশঃ বেশি বেশি উপস্থিত হইবে, আর যদি আমি ভোগ-বিলাস, সন্তানোৎপত্তি, সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে আমার সেবা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আমার দ্বারা দুই নৌকায় পা দেওয়া চলিবে না। যদি পত্নী গর্ভবতী থাকিতেন, তবে নিশ্চিন্ত মনে এই সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়া সম্ভব হইত না। ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা, বিবাহিত হইলেও কুটুম্ব-সেবা সমাজ-সেবার বিরোধী হয় না। এই প্রকার বিচার করিয়া ব্রত লওয়ার জন্য অধীর হইলাম। উহাতে মনে এক প্রকার আনন্দ আসিল ও আমার উৎসাহ বাড়িল। কল্পনায় সেবার ক্ষেত্র বহু বিশাল করিয়া ফেলিলাম।"

ছয় সপ্তাহ মাত্র কাল এই বিদ্রোহের জন্য কাজ করিতে হয়। তারপর তাঁহারা ছুটি পাইয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু যে গান্ধীজী গিয়াছিলেন, তিনি পরিবর্তিত হইয়া ফিরিলেন। এতাবৎ তাঁহার বন্ধুবর্গকে বিবাহ করিতে ও ফিনিক্সে আসিয়া সরল সাম্প্রদায়িক আদর্শ জীবন যাপন করিতে বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি ওয়েষ্টকে বিবাহ করাইয়া আনিয়াছেন, পোলককে বিবাহ দিয়া আনাইয়াছেন। এইবার নব বিবাহিতদিগকে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে বলিতে লাগিলেন, নিজেও ব্রত গ্রহণ করিলেন। "তখনো ইহার মহত্ত্ব ও ইহা পালনের কঠিনতা সম্পূর্ণ বুঝি নাই। উহার মহত্ত্ব দিনে দিনে বেশি করিয়া দেখিতেছি। উহা বিনা জীবন শুষ্ক ও পশুজীবনের মত লাগে। ব্রহ্মচর্যের যে মহিমা ধর্মপুস্তকে দেখা যায়, তাহা পূর্বে অতিশয়োক্তি মনে হইত, তাহার পরিবর্তে আজ মনে হইতেছে যে, সে সকল উক্তি যথার্থ। উহা যে অভিজ্ঞতার ফল, একথা দিন দিনই স্পষ্ট হইতেছে।"

"ব্রহ্মচর্যের এই প্রকার পরিণাম যাহাতে আসে, তাহা সহজ লভ্য নয়, তাহা কেবল শারীরিক বস্তু নয়। শারীরিক সংযম হইতে ব্রহ্মচর্যের আরম্ভ। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে ত বিচারের মলিনতা পর্যন্ত থাকিতে পারে না। যে পর্যন্ত স্বপ্নেও মনোবিকার হইতে পারে, সে পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ রহিয়াছে মানিতে হইবে। সম্পূর্ণতা কেবল প্রভু-প্রসাদে আসিতে পারে। সেইজন্যই ভক্তগণ তপশ্চর্যা দ্বারা পবিত্র করিয়া, আমাদের উদ্ধারকারী রামনামাদি মন্ত্র আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।"

এইবার যেন যোগ্যতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর গান্ধীজীকে জীবনান্ত পর্যন্ত সত্যাগ্রহের যোদ্ধা হওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। অতঃপর হইতে গান্ধীজীর জীবনে সত্যপালন ও সত্যাগ্রহ করা ব্যতীত আর অন্য কর্ম রহিল না

জুলু বিদ্রোহের কালেই জোহানেসবর্গ হইতে ডাক আসিয়াছিল যে, তাঁহার ফিরিয়া আসা দরকার— সরকার আবার একটা সাংঘাতিক আইন করিতেছেন। ছাড়া পাইয়া জোহানেসবর্গে তিনি ফিরিয়া গেলেন। সংবাদ-পত্রে আইনের খসড়া দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

গভর্নমেণ্টকে অনেক অনুনয় করিলেন, যেন আইন না করা হয়। ঐ আইন দ্বারা, ট্রান্সভালে ভবিষ্যতে ভারতবাসীর প্রবেশ ত একেবারে নিষিদ্ধই হইতেছিল, তাহা ছাড়া যাহারা থাকিবে, তাহাদিগকেও ঠিক দাগী আসামীর মত করিয়া রাখার ব্যবস্থাই হইতেছিল। এই প্রকার আইন মানিয়া চলা মনুষ্যত্বের বিরোধী। গান্ধীজী সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করেন ও প্রকাশ্য সভায় এই মন্তব্য গ্রহণ করা হয় যে, কোনও ভারতবাসীই এই আইন মান্য করিবেন না। এই আইন অনুসারে, সকলকেই বাস করার জন্য নতুন করিয়া নাম রেজেস্ট্রী করিতে হইবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সম্প্রদায় স্থির করেন যে, কেহই নাম রেজেস্ট্রী করিবেন না এবং তজ্জন্য যত দুঃখ তাহা সহ্য করিবেন। আইন পাস হইল, গান্ধীজী ও অন্যান্য অনেকে জেলে যাইতে থাকেন। জেনারেল স্মাটস ট্রান্সভালের কর্তা। গান্ধীজীর সহিত তিনি আপোষ করেন যে, যদি স্বেচ্ছায় লোকে একবার নাম রেজেস্ট্রী করে, তবে তিনি ঐ অন্যায় আইন রদ করিয়া দিবেন। সম্প্রদায়ের ও সহকর্মীদের সম্মতি লইয়া তিনি ঐ সর্ত স্বীকার করেন। সকল কয়েদী মুক্ত হয়। যথাকালে ভারতীয়েরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে। কয়েকজন পাঠান গান্ধীজীর আপোষে চটিয়া গিয়া বলে—যে দিন তিনি রেজেস্ট্রী করিতে যাইবেন, সেদিন তাঁহাকে খুন করিবে। গান্ধীজী প্রতিশ্রুত দিবসে স্বাক্ষর করিতে যান। পাঠানেরাও পথে তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে গিয়া, মাথায় বিষম আঘাত করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে, লাথি মারিতে থাকে ও আরো মারপিট করিয়া চলিয়া যায়। গান্ধীজী শুশ্রূষায় ভাল হইয়া উঠেন এবং জ্ঞান হওয়ার পর প্রথম কথাই জিজ্ঞাসা করেন যে, মীর আলম (আক্রমণকারী) কোথায়? তাহাকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শত্রুর প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার তাঁহার মজ্জাগত, উহা লোক দেখানো নয়, বাহিরের ধার করা জিনিস নয়। কাজেই, যেখানেই সত্যিকার আঘাত শত্রুর নিকট হইতে পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকেই রক্ষা করার, সেবা করার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে, প্রতিহিংসার নামও কাহাকেও মুখে আনিতে দেন নাই।

ট্রান্সভালের কর্তৃপক্ষেরা বলেন যে, এ সকল প্রেমের আইন গান্ধীর রাজ্যে চলিতে পারে, কিন্তু ট্রান্সভাল রাজ্যে চলিবে না। ট্রান্সভাল সরকার মীর আলমকে গান্ধীজীর কথায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু ইউরোপীয়দিগের চাপে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া সাজা দেন।

লোকে সন্দেহ করিয়াছিল যে, স্মাটস গান্ধীজীকে ঠকাইয়াছেন। ফলেও তাহাই হয়। সমস্ত লোক স্বেচ্ছায় রেজেস্ট্রী করার পর স্মাটসের গভর্নমেণ্ট বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলেন যে, আইন রদ করা যায় না। পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। গান্ধীজী তিন তিন বার জেলে যান। অনেক লোক সর্বস্বান্ত হয়। আইনে ছিল, রেজেস্ট্রী না করিলে সরকার তাহাকে জেলে দিতে পারে, নির্বাসিত করিতে পারে, দেশান্তরিত করিতে পারে। স্মাটস-গান্ধী-চুক্তি ভঙ্গের পর, সকলে সভা করিয়া রেজেস্ট্রী করা লাইসেন্সগুলি পোড়াইয়া ফেলিয়া দেয় ও পুনরায় জেলে যাইতে আরম্ভ করে। জেলকে ভয় করে না দেখিয়া, সরকার যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া লইয়া আটক করে ও জাহাজ বোঝাই করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতবর্ষে নামাইয়া দিয়া যায়। কাহারও বা স্ত্রী-পুত্র পড়িয়া রহিল, কাহারও বা লাখো টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইল। এমনি অত্যাচার চলিতে থাকে ও তাহা সহ্য করিয়াও সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে। সত্যাগ্রহ নামটা কিন্তু গান্ধীজী অভিধান হইতে বাছিয়া লন নাই। ঐ শব্দ—ঐ নামটা তাঁহার সৃষ্টি। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য দুর্বলপক্ষের যে চেষ্টা, তাহার নাম ছিল "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স"। ঐ ইংরেজী নামেই ট্রান্সভালের আন্দোলন পরিচিত হইতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজী দেখিতে পান যে, "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স" শব্দ দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝানো যায় না। "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সে" সুবিধা হইলে হিংসার প্রয়োগ করা যায় এবং ইহা দুর্বলের অস্ত্র, দুর্বলতা গেলে ইহার ব্যবহারের আর আবশ্যক থাকে না। গান্ধীজী যে প্রতিরোধ-শক্তি ব্যবহার করিতেছেন, তাহা হিংসার নহে, তাহা প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধীকে কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকিতে হইবে। ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য ব্যতীত অসত্যের পক্ষে প্রয়োগ করা যায় না। ইহাতে দ্বেষের স্থান নাই ও ইহা সবলের অস্ত্র—কখনই পরিত্যাজ্য নহে। এই সকল কারণে এই যুদ্ধের নাম 'সত্যাগ্রহ' দেওয়া হয়। সত্যের প্রতি আগ্রহে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সত্য জ্ঞানে যে শক্তি প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহা প্রতিরোধ করিয়া,

যতদুঃখ পাওয়া যায় তাহাই বরণ করিয়া, প্রতিকার প্রত্যাশা করার নাম সত্যাগ্রহ।

এই যুদ্ধকালে গান্ধীজী ১৯০৮ সালে একবার বিলাতে যান। সেখানে চেষ্টার দ্বারা আইন পরিবর্তনের কিছু আশা ছিল। ঐ সময় তিনি জাহাজে 'হিন্দ স্বরাজ্য' * নামক গ্রন্থ লেখেন। ভারতবর্ষের জন্য স্বরাজ কি প্রকারের হইবে এবং তাহা কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, সত্যাগ্রহ কি, তাহার মূল সূত্রগুলি এই পুস্তকে তিনি নির্দেশ করেন।

যেমন কোনও নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করিলে, যন্ত্রের আবিষ্কারক দিনে দিনে উহার উন্নতি সাধন করিতে থাকেন, সত্যাগ্রহ আবিষ্কার করার পর গান্ধীজীরও সেইরূপ অবস্থা হয়। সত্যাগ্রহের নতুন নতুন রহস্য গান্ধীজীর নিকট ধরা পড়িতে থাকে। সত্যাগ্রহের ও গান্ধীজীর জীবনের গতি সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তনের ইতিহাস, তখনকার দিনের 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' পৃষ্ঠায় রহিয়া গিয়াছে। আট বৎসর এই যুদ্ধ চলে। সর্বশেষ অবস্থায়, যখন গান্ধীজী শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার ফিনিক্স আশ্রম ও স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকেই, একযোগে অন্য কর্ম হইতে সরাইয়া সত্যাগ্রহের জন্য উৎসর্গ করেন। বিধাতা প্রসন্ন হন। এই সময় প্রায় দশ হাজার লোক জেলে যায় ও যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে জয়-যুক্ত হয়। 'গিরমিটিয়া'দের মাথা পিছু ৩ পাউণ্ড কর দিতে হইত, তাহা এবং যে জঘন্য আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালানো হয়, তাহা উঠিয়া যায়। গান্ধীজী জয়-শ্রী-মণ্ডিত হইয়া, সত্যাগ্রহ দ্বারা ভারতবর্ষের সেবা করার জন্য, তাঁহার যৌবনের কর্মস্থল, হৃদয়ের বিকাশের স্থল ত্যাগ করিয়া, ১৯১৪ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের পথে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হন। ইংলণ্ডে তখন গোখলে ছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করার ইচ্ছাতেই গান্ধীজী সেখানে যান। ইংলণ্ডে পঁহুছিবার সময়, জাহাজ হইতে নামার পূর্বেই ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

বিলাতে গিয়া সেখানে ভারতীয় ছাত্রমণ্ডলী লইয়া, তিনি যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য শুশ্রূষাকারী সৈন্যদল সৃষ্টি করেন। এই সময় তাঁহার অহিংসনীতি পরিপক্ক হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে বুয়ার-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, ১৯০৬ সালেও

* 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' ৶০, খাদি প্রতিষ্ঠান ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত, গান্ধী সাহিত্যের অন্যতম।

স্বেচ্ছায় জুলু-বিদ্রোহে যোগ দেন। কিন্তু গত আট বৎসরে গান্ধীজীর ভিতর যে ধার্মিক দৃষ্টি পুষ্ট হয়, তাঁহার অহিংসভাব যে প্রকারে বর্ধিত হয়, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা মনে করেন যে, গান্ধীজী আর যুদ্ধের সাহায্য করিতে পারেন না। তখন ও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষেও, ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করায়, তাঁহার উপর প্রশ্ন-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে যে, কেমন করিয়া তাঁহার অহিংস মতের সহিত তাঁহার আচরণের সামঞ্জস্য করা যায়। গান্ধীজী তাঁহার আত্মকথায় যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম এই:—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হিংসার আগুনের ভিতরেই মানুষকে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। যে রাজ্য-ব্যাপারে হিংসার আশ্রয় লওয়া হয়, সেই রাজ্যের প্রজা হইয়া থাকায়, সেই হিংসারই সহায়তা করা হয়, হিংসার আশ্রয়েই জীবন পালন করা হয়। সে অবস্থায় অহিংস ব্যক্তির উচিত যে, যদি সাধ্যে কুলায়, তবে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগ করিয়া দাঁড়ানো ও জেলে যাওয়া। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন যুদ্ধ আসে, বিপদ উপস্থিত হয়, তখন হাত পা গুটাইয়া হিংসার সাহায্য করিব না বলিয়া বসিয়া থাকাও অধর্ম। যে, রাজ্যের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছে, যুদ্ধ বাধিলে তাহার কর্তব্য তখনও সহযোগিতা করিয়া শক্তি সঞ্চয় করা এবং তাহার পর যাহাতে রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হিংসানীতি পরিত্যাগ করানো যায়, তাহার চেষ্টা করা।

১৯১৫—১৯১৯
ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ *

ভারতবর্ষে আসিয়াই, তিনি মনের মত সঙ্গী লইয়া আশ্রম স্থাপন করিয়া, আদর্শ জীবন যাপন করার বাসনায়, জায়গা খুঁজিয়া বেড়ান। আহমেদাবাদে সবরমতী তীরেই অবশেষে এই স্থান স্থির হয়। ১৯১৫ সালেই তিনি আশ্রম স্থাপনা করেন, উহা প্রথমে আহমেদাবাদের কোচরব নামক পল্লীতে ছিল। পরে ১৯১৭ সালে সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়।

কোচরবে থাকা কালীন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিরত হওয়ায় এমন অবস্থা হয় যে, আশ্রমের ২৫।৩০ জন লোকসহ অস্পৃশ্যদের পল্লীতে

* 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ'ও দেখুন। মূল্য ৮০ আনা, খাদি প্রতিষ্ঠান ১৫ কলেজ স্কোয়ারে পাওয়া যায়।

গিয়া থাকিতে ও মজুরের কাজ করিয়া পেট চালাইয়া, দেশের ও ধর্মের সেবা করিতে প্রস্তুত হন। এই সময় অযাচিত ভাবে একজন লোক, যেন ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই, ১৩০০০৲ টাকা বিনা জিজ্ঞাসায়, বিনা পরিচয়ে আশ্রমে দান করেন। মেথর পল্লীতে যাওয়ার আর আবশ্যক হয় না। পরে ঐ অর্থে সবরমতীতে জমি কিনিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতে আসিয়াই, মহামতি গোখলের মৃত্যুতে তিনি প্রথম আঘাত পান। তাঁহার আশা ছিল, গোখলের আশ্রয়ে তিনি কাজ করিয়া যাইবেন। প্রথমেই তিনি ওয়াঢ়াওয়ানের একস্থানে, সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ উপায়ে প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া, সত্যাগ্রহ করিতে সংকল্প করেন। এই সংকল্প করাতেই এতদিন যাহা আবেদন নিবেদনে হয় নাই—তাহাই হইল; গভর্নমেণ্ট আপনা হইতেই অসুবিধা দূর করিয়া দিলেন।

১৯১৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে 'গিরমিটিয়া' প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন ও লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহিত এই বিষয়ে কথা বলেন। তিনি ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ঐ প্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া, বোম্বাই, করাচি ও কলিকাতায় ভ্রমণ ও সভা করিতে থাকেন। ফলে ঐ প্রথা নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই গভর্নমেণ্ট রদ করিয়া দেন।

তাহার পর ১৯১৭ সালেই চম্পারণে নীলকরের অত্যাচার দূর করার জন্য সত্যাগ্রহ করেন ও তাহাতে প্রত্যাশিত শুভ ফল পান। নীলের অত্যাচারের সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করিতে যাইতেই, সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। তিনি আদেশ অমান্য করেন ও তদন্ত চালাইতে থাকেন। সরকার আদেশ প্রত্যাহার করেন। অহিংসা ও সত্যাগ্রহ কি, এই আদর্শের বাস্তব পাঠ সহকর্মীদিগকে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি প্রথম দেন। এই সত্যাগ্রহে জয়লাভ করিয়াই, আহমেদাবাদের মজুর-মালিকের বিবাদে, মজুরদের পক্ষে তিনি সত্যাগ্রহ করিয়া জয়লাভ করেন।

১৯১৮ সালে খেড়া জেলায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। খেড়া জেলায় সে বৎসর ফসল না হওয়ায়, প্রজারা খাজানা দিতে পারে না। আইন ছিল যে, চারি আনা শস্য হইলে সে বৎসর খাজানা আদায় বন্ধ থাকিবে। প্রজারা বলে চারি আনার কম শস্য হইয়াছে, গভর্নমেণ্ট বলেন, না চারি আনার বেশি হইয়াছে। আবেদন নিবেদনে যখন কিছু হয় না, তখন গান্ধীজী প্রজাদের লইয়া সত্যাগ্রহ করেন যে, খাজানা কেহই দিবে না। গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা হয়

জমি বা অন্য সম্পত্তি নিলাম করুন, জব্দ করুন। গভর্নমেণ্ট ঐ কার্য তিন মাস কাল করিয়া পরে ক্ষান্ত হন ও সত্যাগ্রহ জয়লাভ করে। ১৯১৮ সালেই দিল্লীর যুদ্ধ-পরিষদে নিমন্ত্রিত হইয়া, গান্ধীজী ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেন। ঐ কার্য খেড়া জিলাতেই করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি বড়ই পীড়িত হইয়া পড়েন। এই পীড়ায় রোগশয্যায় থাকা কালেই তিনি রাউলাট য়্যাক্টের সংবাদ পান। একটু সুস্থ হইয়া রাউলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে জনমত জানাইবার জন্য, ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সর্বত্র হরতাল ঘোষণা করেন এবং বোম্বাইএ আইন অমান্য করিয়া তাঁহার লেখা নিষিদ্ধ পুস্তক 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' বিক্রয় করেন। বোম্বাইএ ৬ই তারিখ বেশ ভালভাবে প্রতিপালিত হয় ও খুব উৎসাহ দেখা যায়। দিল্লীতে একটা পূর্ব নির্দেশ অনুসারে ৩০শে মার্চ হরতাল হইয়া গিয়াছিল। সেখানে গভর্নমেণ্ট সেদিন হাঙ্গামা করে, অত্যাচার ও গুলি চলে, পাঞ্জাবেও সেই অবস্থা হয়। গান্ধীজী পাঞ্জাব ও দিল্লীতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন। দিল্লীর পথে মথুরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার বোম্বাইএ ফেরৎ আনে। তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ রটনা মাত্র আহমেদাবাদ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে হাঙ্গামা হয়। গভর্নমেণ্ট সর্বত্রই কড়া শাসন সুরু করিয়া দেয় এবং ১৩ই এপ্রিল তারিখ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়। গান্ধীজী পাঞ্জাব যাওয়ার অনুমতি চাহিয়াও তাহা পান না, অথচ তিনি আইন অমান্য করিয়া পুনরায় লোককে উত্তেজিত করিতেও চাহেন না। এই সময় তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবনের' সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

এদিকে পাঞ্জাবে হাণ্টার কমিটি বসে, সেই সময় ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি পাঞ্জাবে গেলে, পাঞ্জাবের জন-সঙ্ঘ তাঁহাকে প্রথম দর্শনেই পুরাতন পরিচিত মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করে। তিনি ও অপর কয়েকজন নেতা, কংগ্রেস পক্ষ হইতে পাঞ্জাব অত্যাচারের তদন্তে নিযুক্ত হন। তাঁহাকেই এই রিপোর্ট লিখিতে হয়। ১৯১৯ সালে কংগ্রেস অমৃতসরে বসে। এই সময় গান্ধীজীর, সমস্ত নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও কর্মের যোগ সাধিত হয়। তিনি অহিংসার ভাবে ওতপ্রোত ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার প্রস্তাব ও কার্যের মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশিত হইতে থাকে। এতাবৎ কংগ্রেসের নিয়ম খুব ঢিলাঢালা ছিল ও প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, ভোটের সময় দর্শক ও প্রতিনিধি সকলেই ভোট দিত। কংগ্রেসও সারা বছর ধরিয়া কাজ

করিত না। তাঁহাকে নিয়ম প্রণয়নের ভার দেওয়ায়, তিনি কংগ্রেসকে নিজের কল্পিত রূপ দান করেন এবং মনে করেন যে, শুদ্ধভাবে কংগ্রেসের নিয়ম পালন করিয়া কাজ চালাইয়া গেলে, আপনা আপনি স্বরাজ আসিয়া পড়িবে। তাঁহার প্রণীত নিয়মাবলী নাগপুর কংগ্রেসে ১৯২১ সালে গৃহীত হয়। ইহার দ্বারা তিনি সত্য ও অহিংসার উপর কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কংগ্রেসের ভিতর দিয়া তিনি জনসাধারণকে পরিচালিত করিয়া যেমন স্বরাজ অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন, তেমনি স্বাবলম্বনের সূচনা স্বরূপ, জনসাধারণের সহিত একত্বের চিহ্ন স্বরূপ, তিনি চরখা ও খাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০৮ সালে যখন 'হিন্দ্ স্বরাজ' লেখেন, তখনই চরখার দ্বারা বস্ত্রের অভাব মিটাইবার কথা বলেন এবং ডাক্তার, উকিল ইত্যাদিকেও চরখার দ্বারা জন-সেবা করিতে নির্দেশ দেন। ১৯১৯ সালে তিনি চরখা প্রচলনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ঐকান্তিক প্রযত্নে, সবরমতী আশ্রমে চরখা-কাটা ও চরখার সূতার কাপড় বোনা আরম্ভ হয়। খাদির জন্মের পর ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য, অহিংসাত্মক প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহের সহিত গঠনাত্মক চরখার কার্য যোগ করিয়া, স্বাধীনতা পাওয়ার যুগ্ম ধারা জন-সমক্ষে মুক্ত করেন।

১৯২০ সালে তাঁহার প্রবর্তিত অসহযোগ কংগ্রেস গ্রহণ করে এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের চিহ্নস্বরূপ, কংগ্রেস হইতে খিলাফতের সমর্থন আরম্ভ হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন যখন পুরাদমে চলিতেছে, তখন গুটিকতক ঘটনায় তিনি দেখিতে পান যে, নেতারাও তাঁহার অহিংসার মর্ম পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। এক আধটুকু হিংসা থাকিলে দোষ নাই, এই ভাবটা, "গান্ধীজী যাহাই বলুন, সকল লোকে এত অহিংস থাকিতে পারে না"। এই প্রকার অভিমতযুক্ত হইয়া, অহিংসা হিংসায় মিশ্রিত অসহযোগ চলিতে আরম্ভ করে। চৌরীচৌরায় একটা হত্যাকাণ্ড হয়। দেশ এই সময় অসহযোগের চরমে পঁহুছিয়াছে। সরকারের সহিত একটা বড় বোঝাপড়া হওয়ার সময় আসিয়াছে বলিয়া যখন প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, তখন তিনি এই সকল ঘটনার সংযোগ বশতঃ অসহযোগ প্রত্যাহার করেন। অনেকে তাঁহাকে এজন্য মন্দ বলিয়াছে, গালি দিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি এখনো বলেন, চৌরীচৌরার পর অসহযোগ স্থগিত করিয়া, তিনি তাঁহার জীবনের বিজ্ঞতম কার্য করিয়াছেন।

ইহার পরই ১৯২২ সালের মার্চ মাসে সরকার তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বৎসরের জেল দেয়, কিন্তু দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই, ১৯২৪ সালের ফেব্রুআরি মাসে তাঁহাকে 'এপেনডিসাইটিস' হওয়ার জন্য ছাড়িয়া দেয়। গান্ধীজী বাহির হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে বিষম দলাদলি ও তাঁহার প্রবর্তিত অসহযোগ অন্য ধারায় প্রবাহিত দেখিতে পান। ১৯২৫ সালের শেষ ভাগেই, তিনি পাটনায় কার্যকরী সমিতির সভা ডাকিয়া, নিজে চরখা-কাটুনী সমিতি গঠন করিয়া, গঠনমূলক কার্যে মন দেন ও রাজনীতি স্বরাজ্যদলের হাতে ছাড়িয়া দেন।

১৯২৫ হইতে ১৯৩০—এ কয় বৎসর তিনি একমাত্র গঠনমূলক কর্মের জন্য তপশ্চর্যা করিতে থাকেন। ইহাতে দেশ-মধ্যে তাঁহার ভাব-ধারা গ্রহণ করিয়া, অহিংসাতে হৃদয়ের বিশ্বাস রাখিয়া, অনেক কর্মী আত্মোৎসর্গ করিয়া কাজ করিয়া যাইতে থাকে। ১৯৩১ সালে লাহোর কংগ্রেসে তাঁহার উপস্থাপিত সত্যাগ্রহ-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়, আইন অমান্য করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য, গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। এ আন্দোলন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতেই থাকিবে এবং গান্ধীজী জানেন যে, যদি একজনও খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকে, তবে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া স্বরাজের অভ্যুদয় হইবে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে, তাঁহার পবিত্রতায় ভারতবর্ষের মোহ-নিদ্রা অপগত হইতেছে। গান্ধীজী ভারতবর্ষে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজীর স্বরাজ মানে, বৈদেশিক অধিকার দূর করা মাত্র নহে। তাঁহার স্বরাজ মানে, ভিতর হইতে নিজের উপর নিজের সংযত অধিকার স্থাপনা, ব্যক্তিগত জীবনের সাধনাকেই রাষ্ট্রের সাধনায় পরিণত করা। এই কার্যের জন্য গান্ধীজী কংগ্রেসকে রাষ্ট্রীয় সাধনার যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরকেই দোষমুক্ত করিয়া, পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে লইয়া যাইতেছেন।

তিনি ভারতবর্ষকে যতটা উন্নত করিয়াছেন, ১৫ বৎসরে যতটা উর্ধ্বে তুলিয়াছেন, আজ তাহার পরিমাপ করা যায় না। গত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ নামিতেছিল। গান্ধীজীর অভ্যুদয়ে, সেই অবনতি বন্ধ হইয়া উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার কাম্য এই যে, ভারতবর্ষ হাজার বছরে যতটা নামিয়াছে, সে পথটা অতিবাহন করিয়া, পূর্বপুরুষেরা যে মোক্ষের

পথে, কল্যাণের পথে, মানব জাতিকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই পথে পূর্বপুরুষদের অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়া যাওয়া।

গান্ধীজী দেখিতে চাহেন যে, হিন্দু, খাঁটি হিন্দু হোক, মুসলমান, খাঁটি মুসলমান হোক ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্মে থাকিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক। তাঁহার ধর্মের কল্পনায় কোথাও বিরোধের স্থান নাই। তাঁহার সমাজ-কল্পনাতেও বিরোধ নাই, সংঘর্ষ নাই। সে সমাজে প্রভু ও ভৃত্য, ছোট ও বড়, মনিব ও মজুরের স্থান আছে, সেখানে অসমতার ভিতরেই সাম্য রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্ম, ট্রাস্টিরূপে করিয়া যাওয়ার আদর্শ রহিয়াছে ও উহাতেই সংঘর্ষের অবসান করিয়া প্রেমের পূর্ণাহুতি। তাঁহার কল্পিত শিক্ষা তাহাই, যাহা মুক্তি দেয়—"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। তাঁহার সাম্য, প্রীতি ও ভক্তির মন্ত্র, সমাজে, সাহিত্যে, ধর্মে ও কর্মে ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়া এক মহাশক্তিশালী জাতি গঠন করিতেছে। তিনি যাহা চাহেন তাহা পাইলে, কেবল ভারতই যে স্বরাজ পাইবে তাহা নহে, তাহার সম্প্রসারণ দ্বারা মানব জাতির সভ্যতার অগ্রগতি হইবে এবং সারা পৃথিবীর প্রত্যেক রাজ্যই স্বরাজ পাওয়ার পথ লইতে পারিবে।

তাঁহার কল্পনা তাঁহার কাছে অলীক খেয়াল বা মনের বিলাস মাত্র নহে, উহা ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য ব্রতের ন্যায় সত্য। তিনি কল্পনানুযায়ী ভারতবর্ষকে গড়িতেছেন। ঈশ্বরের কৃপায়, আজ ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর গান্ধীজী একচ্ছত্র অধিকার বিস্তৃত করিয়াছেন। হিংসার ও অকল্যাণের মার্গ ত্যাগ করিয়া ভারতবাসী কল্যাণের ও শ্রেয়ের পথ লইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার মতবাদ, তাঁহার লেখাগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাণী-সেবায় ভারতের সাহিত্য গৌরবময় হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বর ভারতবাসীকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিবার শক্তি দিন।

জীবনব্রত

সত্য

আমাদের সংস্থার মূল সত্যের আগ্রহের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য সত্য-ব্রত সম্বন্ধেই প্রথমে বলিব।

সত্য শব্দ 'সৎ' হইতে হইয়াছে। সৎ অর্থাৎ যাহা আছে। সত্য তাহাই যাহা থাকিতে পারে। সেইজন্য সত্য ব্যতীত আর কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। সেইজন্যই পরমেশ্বরের যোগ্য নাম হইতেছে 'সৎ' বা 'সত্য'। সেই-হেতুই পরমেশ্বর সত্য একথা বলা অপেক্ষা, সত্যই পরমেশ্বর একথা বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমাদের একজন রাজা কি সর্দার ছাড়া চলে না, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম অধিক প্রচলিত আছে এবং থাকিবেও। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার 'সৎ' বা সত্যই খাঁটি নাম এবং উহা দ্বারাই তাঁহার পূর্ণ অর্থ সূচিত হয়।

আবার যেখানে সত্য আছে সেইখানেই জ্ঞান—শুদ্ধজ্ঞান আছেই। যেখানে সত্য নাই, সেখানে শুদ্ধজ্ঞান সম্ভবেই না। সেইজন্য ঈশ্বরের নামের সহিত চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান শব্দের যোজনা করা হয়। আবার যেখানে সত্যজ্ঞান আছে সেইখানে আনন্দ আছে; শোক সেখানে নাই, কেননা সত্য শাশ্বত, সেইজন্য আনন্দও শাশ্বত। সেইজন্যই ত ঈশ্বরকে আমরা "সচ্চিদানন্দ" বলি।

এই সত্যের আরাধনার জন্যই আমাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেক প্রবৃত্তি, সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস বহে। যদি আমরা ইহা করিতে পারি, তাহা হইলে অন্য সকল প্রবৃত্তি সহজেই আমাদের বশে আসিবে, তাহা পালন করাও সহজ হইবে। সত্য ব্যতীত কোনও নিয়মেরই শুদ্ধ পালন অসম্ভব।

সাধারণতঃ সত্য মানে সত্য কথা বলাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু আমরা এখানে সত্য শব্দ ব্যাপক অর্থেই দেখিতেছি। বিচারে, বাক্যে, আচরণে, সত্যই—সত্য। এই সত্য যিনি সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, জগতে

তাঁহার অন্য কিছুই জানিতে বাকি নাই। কেননা যে কথা উপরে বলা হইয়াছে তদনুসারে, যে সম্পূর্ণ সত্যের আচরণ এবং পালন করিতে পারে, তাহার ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞানও আছে। উহার ভিতরে যাহা নাই তাহা সত্য নয়, তাহা জ্ঞান নয়, তাহা আনন্দই বা হইবে কেমন করিয়া? এই পরীক্ষাটা যদি আমরা প্রয়োগ করিতে শিখি, তাহা হইলে তখনই বুঝিতে পারিব যে, কোন প্রবৃত্তিটা আচরণের যোগ্য আর কোনটা ত্যাজ্য, কোনটা দেখার যোগ্য কোনটা নয়, কোনটা শোনার যোগ্য আর কোনটা নয়।

কিন্তু এই যে সত্য, যাহা পরশ-পাথরের ন্যায়, যাহা কামধেনুর ন্যায়, সে সত্যকে কি করিয়া লাভ করা যায়? ইহার জবাব ভগবান দিয়াছেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকার নামই অভ্যাস, আর সত্য ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তুর বিষয়ে উদাসীনতাই বৈরাগ্য। এবম্প্রকার হইলেও একের পক্ষে যাহা সত্য, অন্যের পক্ষে আবার তাহাই অসত্য, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। যেখানে শুদ্ধ প্রযত্ন আছে, সেইখানেই দেখা যাইবে যে, সত্য, যাহা আমরা আলাদা আলাদা বলিয়া মনে করি, তাহা একই বৃক্ষের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পাতার ন্যায়। পরমেশ্বরকে কি প্রত্যেক মানুষই আলাদা করিয়া জানে না? তাহা হইলেও তিনি যে এক, তাহাও আমরা জানি। আবার সত্য এই নাম পরমেশ্বরেরই। সেইজন্য যে ব্যক্তি সত্য যেমন ভাবে দেখে, সে সেই অনুরূপ আচরণ করিলে দোষ নাই—বরঞ্চ ঐ প্রকার করাই কর্তব্য। যদি উহাতে ভুল থাকে, তবে আপনা আপনিই তাহার সংশোধন হইয়া যায়, কেননা সত্যের অনুসন্ধানের পশ্চাতেই তপশ্চর্যা রহিয়াছে, অর্থাৎ নিজের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। এই দুঃখ-সহনের সীমা নাই, মরণান্ত পর্যন্ত পণ থাকা চাই, অর্থাৎ স্বার্থের গন্ধও ইহাতে থাকিতে পারিবে না। এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিয়া কেহ শেষ পর্যন্ত বিপথে চলে নাই। বিপথে গেলেও পুনরায় সে ঠিক পথেই আসিয়া দাঁড়ায়। সেই হেতু সত্যের আরাধনাই ভক্তি। ভক্তি ত মাথার মূল্য দিয়া কিনিতে হয়।

সত্যের আরাধনা হরির মার্গ, উহাতে ভীরুতার স্থান নাই, এ পথে কদাচ হার নাই। ইহা মরিয়া বাঁচার মন্ত্র।

এখন আমরা প্রায় অহিংসার কোঠায় আসিয়া পড়িলাম। অহিংসার আলোচনা আগামী সপ্তাহে হইবে।

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র, প্রহ্লাদ, রামচন্দ্র, ইমাম হোসেন, হাসেন, খ্রীষ্টীয় সাধু ইত্যাদির দৃষ্টান্ত আলোচনা করা দরকার। যদি আশ্রমের সকলে, ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ, খাইতে শুইতে চলিতে বসিতে, সমস্ত কার্য করার সময় আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত কেবল সত্যেরই রটনা করে, সত্যের রটনা করিতে করিতে নির্দোষ নিদ্রায় দিন শেষ করে, তবে কেমন সুন্দর হয়? এই সত্যরূপ পরমেশ্বর আমার কাছে রত্ন-চিন্তামণি স্বরূপ হইয়াছেন, তোমাদের সকলের কাছেও তিনি তাহাই হইয়া উঠুন।

য়েরোড়া মন্দির
২২-৭-৩০
প্রাতঃকালীন প্রার্থনা অন্তে।

অহিংসা

এই লেখার আরম্ভ কৌতুকজনক এবং দুঃখদায়কও বটে। কাপড়ের তৈরি যে খামগুলি আমার কাছে আসে, সেগুলি কি করিয়া বাঁচানো যায় ও বারে বারে ব্যবহার করা যায়, সেই আলোচনা আমাদের মধ্যে হইতেছিল। কথাটা ছিল যে, সমস্তটা খামের উপরই নতুন কাগজ আঁটা হইবে, না কেবল যেখানে যেখানে লেখা আছে সেইখানে আঁটা হইবে। এই আলোচনা নিরর্থক। ইহাতেই প্রার্থনার পরের সুন্দর পনের মিনিট সময় কাটিয়া গেল। পরিণামে আমাদের মূর্খতাই প্রমাণিত হইল। ইহাতে সত্য অহিংসা ও বিবেকের হানি হইল। সত্যকে পীড়িত করা হইল—কেননা এই কথোপকথনের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানের তীব্রতা ছিল না। অহিংসা ম্লান হইল, কেননা যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত এই বর্তমান দুঃখের দর্শন করিতে ও তাহার উপায়ের চিন্তা করিতে লাগানো দরকার, সেই সময় হইতে অমূল্য পনের মিনিট কাল নিরর্থক কথোপকথনে ব্যয় হইল। বিবেকের রক্ষা হইল না, কেননা যদি কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিতে হইত, তবে এই কথোপকথন এক মিনিটও চলিত না। জনসাধারণের পনের মিনিট চুরি করিয়া তারপর উভয়েই নিজেদের মূর্খতা টের পাইলাম এবং ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নিকট মিনতি করিলাম। এই ঘটনার কথা এখানে ইচ্ছাপূর্বকই উল্লেখ করিতেছি।

সত্যের ও অহিংসার পথ যেমন সোজা, আবার তেমনি সংকীর্ণও বটে ইহা যেন তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলা। যে খেলোয়াড় শূন্যে দড়ির উপর চলার খেলা দেখায় সে একাগ্র হইয়াই চলিয়া থাকে; কিন্তু তাহার রশি অপেক্ষাও সত্যের রশি সূক্ষ্ম। একটু অসাবধান হইলেই আর কথা নাই, একদিকে পড়িয়া যাইতে হইবে। প্রতিক্ষণ সাধনা দ্বারাই সত্য ও অহিংসার দর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু এই দেহ থাকিতে সত্যের সম্পূর্ণ দর্শন অসম্ভব। সত্যের কল্পনা মাত্র করা যাইতে পারে। ক্ষণিক দেহদ্বারা শাশ্বত ধর্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য শেষকালে শ্রদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়।

এমনি করিয়াই জিজ্ঞাসু অহিংসার পথে যাত্রা করে। আমাদের পথে কষ্ট ত আছেই। প্রশ্ন এই যে, অহিংসার পথে যে কষ্ট তাহা সহ্য করিব, না যে কষ্ট দেয় তাহাকে বিনাশ করিয়া চলিব? জিজ্ঞাসু দেখিতে পাইবে যে, বিনাশ করিয়া চলিলে যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই থাকিবে, রাস্তা বাহির হইবে না। যে সংকট সহ্য করে সেই অগ্রসর হয়। প্রথমেই যে নাশ করিতে যায়, সে দেখিতে পাইবে যে, সে যে সত্যের অনুসন্ধান করিতেছে উহা বাহিরে পাওয়ার জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস। সেইজন্য সে যেমন নাশ করিতে থাকে, তেমনি সে পিছনে পড়িতে থাকে, সত্যও দূরে যাইতে থাকে।

আমাদের উপর চোরের উপদ্রব হইল, আমরা উহা হইতে বাঁচার জন্য তাহাকে সাজা দিলাম। তখন সে পলাইল বটে, কিন্তু অন্য জায়গায় গিয়া সেই কর্মই করিল। কিন্তু অন্য জায়গাও ত আমাদেরই; সেইজন্য আমাদের অবস্থা অন্ধ গলিতে প্রবেশ করার মত হইল। চোরের উপদ্রব বাড়িতেই থাকিল, কেননা চোর ত চুরি করাকেই ধর্ম মনে করে। আমরা দেখিলাম যে, ইহা অপেক্ষা চোরের উপদ্রব সহ্য করাই ভাল। উহাতে চোর বুঝিতে পারিবে। এইভাবে সহ্য করায় আমরাও দেখিতে পাইব যে, চোর আমাদের পর নয়। আমাদের ত সকলেই আত্মীয়, সকলেই মিত্র, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে নাই। কিন্তু কেবল উপদ্রব সহ্য করাই যথেষ্ট নয়। উহা হইতে ভীরুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এখনো আরও বিশেষ কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। চোর যদি আমাদের ভাই-ই হয়, তবে তাহার মধ্যে বিচার করার শক্তি উপস্থিত করা চাই। আমরা চোরকে নিজের করিয়া লওয়ার জন্য উপায়

খুঁজিতে পুরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম—ইহাই হইল অহিংসার পথ। ইহাতে উত্তরোত্তর কেবল দুঃখ সহ্য করার কথাই আসিয়া পড়ে। ইহার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য রক্ষা করা শিক্ষার কথা আসিয়া পড়ে। এইরূপ যদি হয়, তবে পরিণামে চোরও সাধু হয়, আমাদেরও সত্যের দর্শন অধিকতর স্পষ্ট হয়। ইহা দ্বারাই আমরা জগতকে মিত্র করিতে শিখি। ইহাতেই ঈশ্বরের, সত্যের মহিমা অধিক জানা যায়, সংকটের মধ্যেও শান্তির সুখ বাড়িয়া চলে। আমাদের মধ্যেও সাহস ও দুঃসাহসিকতা বাড়িয়া চলে, আমরা শাশ্বত ও অশাশ্বতের মধ্যে ভেদ অধিক বুঝিতে পারি। কর্তব্য অকর্তব্যের বিবেক জন্মে, অভিমান নষ্ট হইয়া যায়, নম্রতা বাড়ে, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা পরিগ্রহ ক্রমশঃই কমিতে থাকে ও দেহের মধ্যের ময়লা নিত্যই কম হইতে থাকে।

এই প্রকার অহিংসাই যে অহিংসার মূল বস্তু তাহাও নয়। কাহাকেও না মারা ত আছেই। উত্তেজিত হওয়াও হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ হিংসা, দ্বেষও হিংসা। কাহারও মন্দ ইচ্ছা করা হিংসা। যাহা জগতের থাকা চাই, তাহার উপর দখল বসানো হিংসা। কিন্তু আমরা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তবে না জগতকে দেখিতে পারিব? আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানেই কত শত সূক্ষ্ম জীব পিষ্ট হইতেছে। এই জায়গায় তাহারাই ছিল! তাহা হইলে করা যায় কি, আত্মহত্যা করিব? যদি চিন্তায় আমরা দেহের প্রতি আসক্তি মাত্র ত্যাগ করি, তবে দেহও আমাদিগকে ত্যাগ করিবে। এই মোহমুক্ত স্বরূপই সত্যনারায়ণ। অধীর হইলে ইহার দর্শন পাওয়া যায় না। দেহ আমাদের নয়, আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, এই প্রকার বুঝিয়া দেহের যে ব্যবহার করা উচিত তাহা করিলেই আমাদের রাস্তা খোলসা হইয়া যাইবে। আমার ইচ্ছা ছিল সহজ করিয়া লেখা, কিন্তু হইয়া গেল কঠিন। তাহা হইলেও যে অহিংসার অল্প মাত্রও বিচার করিয়াছে, তাহার বুঝিতে মুশকিল হইবে না।

সকলে এ কথাটা জানিয়া লও—অহিংসা ব্যতীত সত্যের জ্ঞান অসম্ভব। অহিংসা ও সত্য এমন ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে যে, উহা একটা টাকার এ-পিঠ ও-পিঠের মত। উহাকে যে দিকেই উল্টাও টাকা টাকাই থাকিয়া যায়। তাহা হইলেও অহিংসাকে সাধন বলিয়া গণ্য করা চাই, সত্যকে, সাধ্য জানিবে। সাধন আমাদের হাতের জিনিস। ইহার জন্যই অহিংসা পরম ধর্ম হইয়াছে। সত্য পরমেশ্বর হইয়াছে। যদি সাধন যত্ন করিয়া অভ্যাস করি,

তবে সাধ্য কোনও দিন ত দেখা দিবেই। এইভাবে নিশ্চয় সংকল্প করিলে ইহাতে জগতকে জয় করা যায়। আমাদের পক্ষে যতই সংকট আসুক না কেন, বাহ্যদৃষ্টিতে আমাদের যতই হার দেখা যাক না কেন, আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া একমাত্র মন্ত্র জপ করিয়া যাওয়া চাই :—"সত্য আছে—এক সত্যই আছে, সত্যই এক পরমেশ্বর। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের পথও একটি মাত্রই আছে, একটি মাত্র সাধন আছে, তাহা হইতেছে অহিংসা। তাহাকে কদাপি ছাড়িব না। যে সত্যরূপ পরমেশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিনিই ইহা পালন করার বল দিন।"

য়েরোড়া মন্দির

২৯-৭-৩১

ব্রহ্মচর্য

আমরা যে সকল ব্রত লইয়াছি, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্রত হইতেছে ব্রহ্মচর্য। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, অন্য সমস্ত ব্রতই এক সত্য-ব্রত হইতেই উৎপন্ন এবং সেই ব্রত পালনের জন্যই অন্য সকল ব্রতের আবশ্যক। যে মানুষের হৃদয় সত্যেই ভরা, যে সত্যেরই উপাসনা করে, সে যদি অন্য কোনও বস্তুর আরাধনা করে, তবে ত সে ব্যভিচারী বলিয়াই গণ্য হয়। এমন অবস্থায় সে বিকার বা অসংযমের আরাধনা কি করিয়া করিতে পারে? যাহার সমস্ত প্রবৃত্তিই কেবল সত্যের দর্শন করার জন্য উৎসর্গিত, সে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন কার্যে বা গৃহ-সংসার চালাইবার কার্যে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে? ভোগ-বিলাস করিয়া সত্য লাভ করিয়াছে, এমন একটা দৃষ্টান্তও আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই।

আবার অহিংসা ব্রত পালনের কথা ধর, তাহারও পূর্ণ পালন ব্রহ্মচর্য ছাড়া হইতে পারে না। অহিংসা মানে সর্বব্যাপী প্রেম। যেখানে পুরুষ এক স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি প্রেম সমর্পণ করে, সেখানে তাহাদের কাছে অন্যের জন্য আর কি রহিল। ইহার অর্থ ত এই হয় যে, "আমরা দুইজনে সর্বাগ্রে—অপর সকলে পরে"। পতিব্রতা স্ত্রী নিজের স্বামীর জন্য ও পত্নীব্রত পুরুষ নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বস্ব হোম করিতে প্রস্তুত হয়, সেইজন্য তাহাদের দ্বারা

সর্বব্যাপী প্রেমের পালন করা যে হইতে পারে না, ইহা স্পষ্ট। সেইজন্যই তাহারা সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের কুটুম্ব করিয়া লইতে পারে না, কেননা তাহাদের কাছে "নিজেদের" বলিতে একটা পরিবারই বুঝাইয়া থাকে, অথবা বুঝাইবার দিকে যায়। তাহাদের এই বৃত্তি যতই বৃদ্ধি হয়, ততই সর্বব্যাপী প্রেমের বিক্ষেপ হয়। সারা জগতেই আমরা এই অবস্থা দেখিতেছি। সেইজন্যই ত যে অহিংসাব্রত পালন করিতে চায় তাহার বিবাহ করা চলে না, বিবাহের বহির্ভূত যে বিকার তাহার আর কথা কি? তাহা হইলে, যে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে তাহার উপায় কি? সে কি কোনও দিন সত্যের দর্শন পাইবে না? সে কি কখনো সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিবে না? আমরা তাহাদের রাস্তাও করিতে পারি; বিবাহিতেরা অবিবাহিতের ন্যায় হইয়া যাইবে। এই দিক দিয়া ইহার মত সুন্দর আর দ্বিতীয় কোনও অনুভবই নাই। এই অবস্থার রস যে পান করিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিতে পারে। এই পরীক্ষা সফলতা যে লাভ করিয়াছে আজ ত সে কথা বলা যাইতে পারে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যখন একে অপরকে ভাই ভগ্নীর মত গণ্য করে, তখন অপর সকল জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া যায়। জগতের যত স্ত্রী সকলেই ভগ্নী, সকলেই মাতা, সকলেই কন্যা—এই অনুভূতি মানুষকে একেবারে উচ্চে লইয়া যায় এবং বন্ধন হইতে মুক্তিদানের হেতু হয়। এই ভাব পালনে পতি-পত্নী কিছুই খোয়ায় না, বরঞ্চ নিজেদের পুঁজি বাড়ায়, কুটুম্ব বাড়ায়, পরস্পরের মধ্যে বিকারের মলিনতা কাটিয়া গিয়া প্রেমও বাড়িয়া যায়। দুইজনার মধ্য হইতে বিকার চলিয়া যাওয়ায় একে অপরকে অধিক সেবা করিতে পারে, দুইজনের মধ্যে কলহের হেতু কমিতে থাকে। যেখানে প্রেম একদেশদর্শী ও স্বার্থপর, সেইখানেই কলহের স্থান বেশি।

উপরে যে প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিলাম উহা বিচার করার পর, উহাকে হৃদয়ের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পর, ব্রহ্মচর্য হইতে যে শারীরিক লাভ, বীর্য লাভ ইত্যাদি হয়, সে সমস্ত গৌণ হইয়া পড়ে। ইচ্ছাপূর্বক ভোগ-বিলাসের জন্য বীর্যহানি করা, শরীরকে নীচু করিয়া ফেলা, কত বড় মূর্খতার কাজ! বীর্যের ব্যবহার উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়াইবার জন্য। উহাকে বিষয় ভোগের জন্য ব্যবহার করায় উহার অতিশয় অপব্যবহার করা হয় এবং উহা হইতে অনেক রোগেরও সূত্রপাত হয়।

এই ব্রহ্মচর্য মন বাক্য ও দেহ দ্বারা পালন করিতে হয়। ব্রত মাত্র সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। আমরা গীতাতেই একথা জানিয়াছি যে, যে ব্যক্তি শরীরকে সংযত রাখে কিন্তু মনে মনে বিকার পোষণ করে সেই মূঢ় মিথ্যাচারী। সকলেই ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে।

মনকে বিকারের বশীভূত থাকিতে দিয়া শরীরকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টায় লোকসানই হয়। মন যেখানে পড়িয়া আছে, অবশেষে সেখানে সে শরীরকে টানিয়া লইয়া যাইবেই। এইখানে একটা প্রভেদের কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার—মনের নিজের ইচ্ছায় বিকারের বশ হওয়া এক কথা, আর মনের নিজের অনিচ্ছায় বলপূর্বক বিকারগ্রস্ত হয়, সে আর এক কথা। আমরা এই শেষোক্ত বিকারের সহায়ক হই না বলিয়া অন্তিমে আমাদের জয়ই হয়। আমরা প্রতিক্ষণ একথা অনুভব করি যে, শরীর হাতের মধ্যে আছে, কিন্তু মন ত নাই; সেইজন্য শরীরকে তৎক্ষণাৎ বশে আনিয়া মনকে বশে আনার জন্য নিত্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের কর্তব্য পূর্ণ পালন করা হইবে। মনকে বশীভূত করিয়া, শরীর দ্বারা যদি মনের বিরোধ করা হয়, তাহা হইলেই মিথ্যাচার আরম্ভ হয়। মনকে দমাইয়াই যাইতে হইবে এবং যতদিন না দমে ততদিন মন ও দেহের বিকারও সাথে সাথে চলিবে একথা বলা যায়।

এই ব্রহ্মচর্য পালন অতিশয় কঠিন, প্রায় অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ করা হয় বলিয়াই এরূপ হয়। জননেন্দ্রিয়ের বিকার নিরোধ করিলেই ব্রহ্মচর্য পালন করা হইল বলিয়া ধরা হয়। আমার কাছে এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও খারাপ বলিয়া মনে হয়। বিষয়-ভোগ মাত্রই নিরোধ করার নাম ব্রহ্মচর্য। যে ব্যক্তি অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে দিয়া একটা ইন্দ্রিয় মাত্র রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, সে যে নিষ্ফল প্রযত্ন করে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কান দ্বারা বিকার যুক্ত কথা শুনিবে, চক্ষু দ্বারা বিকার উৎপাদনকারী বস্তু দেখিবে, জিহ্বাদ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তুর স্বাদ লইবে, হাতদ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তুর স্পর্শ করিবে, আবার জননেন্দ্রিয়কে বশে রাখার আশা করিবে, এ যেন ঠিক আগুনে হাতটা ঢুকাইয়া দিয়া তারপর হাত না পোড়াইতে চেষ্টা করা। সেইজন্য যে জননেন্দ্রিয় রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তাহাকে অন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্যের

সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা যে হানি হইতেছে তাহা আমি সর্বদাই দেখিতে পাইতেছি আমার দৃঢ় অভিমত এই যে এবং আমার অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে যে, যদি আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় এক সাথে বশ করার অভ্যাস করি, তাহা হইলেই জননেন্দ্রিয় বশে আনার চেষ্টা শীঘ্রই সফল হইতে পারে, সফল হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রধান জিনিস হইতেছে স্বাদের ইন্দ্রিয়। সেইজন্যই ত এই ইন্দ্রিয়ের সংযমকে আমরা একটা আলাদা জায়গাই দিয়াছি। উহার বিচার পরে করিব।

ব্রহ্মচর্যের মূলগত অর্থ যেন সকলে মনে রাখে। ব্রহ্মচর্য মানে—ব্রহ্মের অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানে চর্যা অর্থাৎ তৎসঙ্গত আচরণ। এই মূল অর্থ হইতে সর্বেন্দ্রিয় সংযম—এই বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য মানে কেবল জননেন্দ্রিয় সংযম, এই অসম্পূর্ণ অর্থ তোমরা ভুলিয়া যাইও।

য়েরোড়া মন্দির
মঙ্গল প্রভাত।
৫—৮—৩০

অস্বাদ

এই ব্রত ব্রহ্মচর্যের সহিত খুবই নিকট সম্বন্ধযুক্ত। আমার ত এই অভিজ্ঞতা যে, এই ব্রত রক্ষা করিতে পারিলে জননেন্দ্রিয়-সংযম অতিশয় সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এই অস্বাদ-ব্রতকে একটা ভিন্ন স্থান দেওয়া হয় না। বড় বড় মুনিরাও স্বাদকে জয় করিতে পারেন নাই, সেইজন্যই ইহাকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ইহা কেবল আমার অনুমান মাত্র। তবে এইরূপ হোক আর না-ই হোক, আমরা এই ব্রতকে একটা স্বতন্ত্র স্থান দিয়াছি, সেইজন্য স্বতন্ত্র ভাবে ইহার আলোচনা করিতে হয়।

অস্বাদ মানে স্বাদ না লওয়া। স্বাদ মানেই রস। যেমন আমরা ঔষধ খাওয়ার সময় ঔষধটা স্বাদু কি না এ বিচার না করিয়া যতটা আবশ্যক ততটুকু মাত্র খাইয়া থাকি, অন্নাদির সম্বন্ধেও সেই প্রকার জানিও। অন্ন মানে খাদ্য পদার্থ মাত্র। অন্ন বলিতে দুধ ফলাদিও বুঝাইতেছে। যেমন ঔষধ যদি কম মাত্রায় খাওয়া যায়, তবে ফল হয় না, অথবা কম ফল হয়

এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হানি হয়, অন্নের সম্বন্ধেও তাহাই। সেইজন্য যদি কোনও বস্তু কেবল স্বাদ লওয়ার জন্য খাওয়া হয়, তাহা হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়। স্বাদু জিনিস বেশি খাইলে ত ব্রত ভঙ্গ হয়ই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কোনও খাদ্য বস্তুর স্বাদ বাড়াইবার জন্য, অথবা স্বাদ বদলাইবার জন্য, অথবা বিস্বাদ দূর করার জন্য তাহাতে লবণ সংযোগ করাও ব্রত ভঙ্গ করা। কিন্তু খাদ্যে এতটা লবণের আবশ্যকতা আছে জানিয়া তাহাতে সে পরিমাণ লবণ দেওয়া ব্রত ভঙ্গ নহে। শরীর পালনের জন্য যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, মনকে ঠকাইবার জন্য উহাতে আবশ্যকতার আরোপ করিয়া কোনও বস্তু ব্যবহার করা ত মিথ্যাচার বলিয়া ধরা হইবে।

এই ধরণের যুক্তি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, অনেক বস্তু, যাহা শরীর রক্ষার আবশ্যক না হইলেও আমরা আহার করিয়া থাকি, সে সমুদয় ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। ইহাতে করিয়া অসংখ্য খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার সহজেই কমিয়া যায় এবং বিকার মাত্র শান্ত হয়।

“পেটকে ধর বেগার
পেট বাজারে সেতার”।

এই ধরণের প্রবাদে বড় সার কথা রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে যদি অল্পমাত্র দৃষ্টিও দেওয়া যায়, তাহা হইলে খাদ্যের সম্বন্ধে পছন্দ করা প্রায় অসম্ভব হয়। যাহাদিগের মা-বাপ অন্যায় আদর দেখাইয়া ছেলেবেলা হইতেই নানাপ্রকার আস্বাদ করাইয়া শরীরকে বিগড়াইয়া দিয়াছে ও জিভকে কুকুরের জিভ বানাইয়া দিয়াছে, বড় হইয়া তাহারা বুঝিতে পারিলেও, তাহাদের শরীর সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিলে রুগ্ন, আর স্বাদের দৃষ্টিতে দেখিলে মহাবিকারগ্রস্ত বলিয়া দেখা যায়। ইহার কুফল আমরা পদে পদে দেখিতে পাই এবং এজন্য অনেক খরচার মধ্যেও পড়িয়া যাই। বৈদ্য ও ডাক্তারের হাতে গিয়া পড়ি এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার পরিবর্তে তাহাদেরই গোলাম হইয়া পড়িয়া আতুরের মত হইয়া থাকি। একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য বলেন যে, তিনি ইহজগতে একজনও নীরোগ ব্যক্তি দেখিতে পান নাই। এতটুকু স্বাদের জন্য শরীর নিজ ধর্ম ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার পর সেই শরীরের জন্যই উপবাসের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে।

এই সমস্ত যুক্তি শুনিয়া কেহ যেন শঙ্কিত হইও না। অস্বাদ-ব্রত ভয়ংকর বলিয়াই এই ব্রত ত্যাগ করার আবশ্যক নাই। আমরা যখন কোনও

ব্রত লই, তখন যে তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই পালন করিতে পারিব, এমন অর্থ করা যায় না! ব্রত লওয়া মানে, তাহার জন্য বাস্তবিক দৃঢ়ভাবে মরণান্ত পর্যন্ত মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা চেষ্টা করিয়া যাওয়া। অমুক ব্রতটা পালন করা মুশকিল, সেইজন্যই তাহার ব্যাখ্যা খাটো করিয়া মনকে ঠকানো উচিত নয়। নিজের সুবিধার জন্য যেখানে আদর্শকে খাটো করা হয়, সেখানে সত্য ত্যাগ করা হয়, নিজের পতন আনা হয়। আদর্শকে আমার ক্ষমতা অক্ষমতার বিচার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন, সেই আদর্শ লাভ করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করাই পরম-অর্থ—পুরুষার্থ। পুরুষ মানে কেবল নর মনে না করিয়া উহার মূল অর্থ বুঝিবে। পুরে অর্থাৎ শরীরে যে বাস করে, সেই পুরুষ। এই অর্থ করিলে পুরুষার্থ শব্দ নর নারী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজ্য হয়। যে ব্যক্তি তিন কালে মহাব্রতসমূহ সম্পূর্ণ ভাবে পালন করিতে পারে, তাহার এই জগতে কিছুই করার থাকে না, সে ভগবান হইয়া যায়, সে মুক্ত। আমরা ত অল্প-মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু, সত্যের অনুসন্ধানকারী ক্ষুদ্র প্রাণী। সেইজন্যই গীতার ভাষায় বলিতে গেলে, ধীরে ধীরে কিন্তু অতন্দ্রিত থাকিয়া চেষ্টা করিয়া যাইতেই হইবে। যদি এই প্রকার করি, তবে কোন না কোন দিন ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত হইব এবং আমাদের সমস্ত 'রসের' আকাঙ্ক্ষাই শেষ হইয়া যাইবে।

অস্বাদ ব্রতের মহত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাকি, তবে উহা পালন করার জন্য নতুন করিয়া চেষ্টা করা দরকার। তাই বলিয়া ২৪ ঘণ্টা খাওয়ার কথাই ভাবিবার আবশ্যক নাই, কেবল সাবধানতা, কেবল জাগৃতিরই অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপ চেষ্টা করিলে আমরা অল্প সময় মধ্যেই, কোনটা স্বাদের জন্য খাইতেছি, আর কোনটা শরীরের জন্য খাইতেছি তাহা বুঝিতে পারিব।

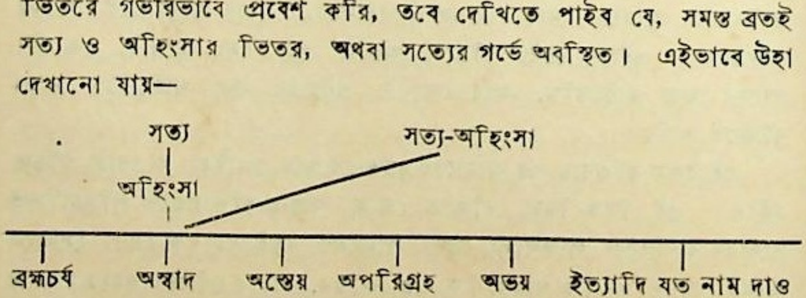
এই রকম বুঝিবার পর আমাদের দৃঢ়ভাবে স্বাদ কমাইয়া যাওয়াই উচিত হইবে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অস্বাদ-বৃত্তি হইতে পরিচালিত সাধারণ বা সংযুক্ত পাকশালা, ব্রত পালনের বড়ই সহায়ক হয়। সেখানে আমরা প্রতিদিন কি খাইব, কি রান্না করিব, তাহার খোঁজ লওয়ার দরকার হয় না, যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ভিতরে আমার যাহা ত্যাজ্য নহে তাহাই, ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া, মনে মনে ভালমন্দ সমালোচনা না করিয়া, শরীরের আবশ্যক অনুরূপ খাইয়া উঠিতে পারি। এইরূপ করায় সহজেই

অস্বাদব্রত পালন করা যাইতে পারে! যাঁহারা সাধারণ পাকশালার ভার লন, তাঁহারাই আমাদের বোঝা হাল্কা করিয়া দেন। তাঁহারা আমাদের ব্রতের রক্ষক হইয়া পড়েন। স্বাদের দৃষ্টিতে ত পাক করা নয়, দশজনার শরীর যাহাতে টিকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাক করিতে হইবে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আদর্শ অবস্থায় অগ্নির ব্যবহার খুব কমই আবশ্যক, অথবা আদৌ আবশ্যক নাই। সূর্যরূপী মহা অগ্নি যাহা পাকাইয়াছে, তাহা হইতেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করা চাই এবং তাহা করিলে মনুষ্য যে কেবল ফলাহারী প্রাণী তাহাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এত গভীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চাই না। এখানে ত আমরা কেবল অস্বাদ ব্রত কি, তাহাতে কি অসুবিধা আছে বা নাই এবং ব্রহ্মচর্য পালনের সহিত সর্বাংশে তাহার কত নিকটসম্বন্ধ, সেই কথাই বিচার করিতেছি। এই সকল কথা এখন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলেই যথাশক্তি এই ব্রত পালনের জন্য যেন শুভ প্রযত্ন করে।

য়েরোড়া মন্দির
১২-৮-৩০

অস্তেয়

এখন আমরা অস্তেয় ব্রতের কথা আলাচনা করিব। যদি এই বিষয়ের ভিতরে গভীরভাবে প্রবেশ করি, তবে দেখিতে পাইব যে, সমস্ত ব্রতই সত্য ও অহিংসার ভিতর, অথবা সত্যের গর্ভে অবস্থিত। এইভাবে উহা দেখানো যায়—



সত্যের মধ্যেই অহিংসাকে ধরা যায়, অথবা সত্যকে অহিংসার জুড়ি মনে করা যায়। দুই-ই এক কথা। তাহা হইলেও আমার মন প্রথম ভাবের দিকেই আকৃষ্ট রহিয়াছে এবং শেষ স্থিতি দুইয়ের সংযোগ বা

দ্বন্দ্বের অতীত পরম সত্য তখন একাই দাঁড়াইয়া থাকে। সত্য হইতেছে সাধ্য, অহিংসা তাহার একমাত্র সাধন। অহিংসা যে কি তাহা আমরা জানিয়াছি, উহা পালন করা কঠিন। সত্যের কেবল অংশ মাত্রই জানিতে পারি, সম্পূর্ণভাবে সত্য জানা দেহীর পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি সম্পূর্ণভাবে অহিংসা পালন করাও দেহীর পক্ষে কঠিন।

অস্তেয় মানে চুরি না করা। কোনও ব্যক্তি চুরি করিয়া একথা বলিতে পারে না যে, সে সত্য জানে ও প্রেমধর্ম পালন করে। তাহা হইলেও আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞানে ও অজ্ঞানে চুরির অপরাধ করিতেছি। অন্যের জিনিস তাহার অনুমতি না লইয়া লওয়া ত চুরি বটেই, নিজের জিনিসও লোকে চুরি করিয়া থাকে। যেমন ধর, কোনও বাপ যখন ছেলেদিগকে না জানাইয়া, বা তাহাদিগকে না জানাইবার জন্য চুপি চুপি কোনও জিনিস খায়। আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার আমাদের সকলেরই—একথা বলা যায়, তথাপি সেখান হইতে লুকাইয়া যদি এক টুকরা গুড়ও কেহ লয়, তবে সে চোর হয়। একটি বালক যদি অপরের কলম লয়, তবে সে চুরি করে। যাহার জিনিস তাহার সম্মুখেও যদি না বলিয়া তাহা লওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহা চুরিই করা হয়। এ জিনিসটা কাহারও নয় ইহা মনে করিয়া নিজে লওয়াও চুরি করা। সেইজন্যই রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া জিনিসের মালিক আমরা নই। সেই প্রদেশের রাজা অথবা রাজ-তন্ত্র উহার মালিক। আশ্রমের কাছাকাছি যদি কোনও জিনিস কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তবে আশ্রমের কর্তাকে সমর্পণ করা চাই। কর্তা যদি দেখেন যে তাহা আশ্রমের নয়, তবে তিনি তাহা পাহারাওয়ালাকে দিয়া দিবেন।

এ পর্যন্ত বুঝা সাধারণতঃ সহজ। কিন্তু অস্তেয় ইহা অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যে বস্তুর আবশ্যক নাই, সে বস্তু যদি উহার মালিকের অনুমতি লইয়াও লওয়া হয়, তবে তাহা চুরি করা হয়। আবশ্যক নাই এমন একটি জিনিসও রাখিতে নাই। সংসারে এই ধরণের চুরি খাদ্য পদার্থ সম্বন্ধেই খুব বেশি হইয়া থাকে। অমুক ফলটার আমার আবশ্যক নাই তবুও আমি যদি তাহা খাই, অথবা যতটা দরকার তাহার অপেক্ষা বেশি লই, তবেই চুরি করা হয়। সত্যকার প্রয়োজন কতখানি মানুষ তাহা সকল সময় জানেও না। বস্তুতঃ অনেক সময়ই আমাদের যতটা আবশ্যক হওয়া উচিত তাহার অপেক্ষা আবশ্যক বাড়াইয়া ফেলি, আর এমনি করিয়া আমাদের

অজ্ঞাতসারেও চোর হইয়া যাই। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অনেক আবশ্যক আমরা কমাইতে পারি। যে ব্যক্তি অস্তেয় পালন করিবে, সে উত্তরোত্তর নিজের আবশ্যক কমাইতে থাকিবে। জগতের অনেক দারিদ্র্য অস্তেয় ভঙ্গ করার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরে যে সকল বিষয় বলা হইল, সে সমস্তই বাহ্য অথবা শারীরিক চুরির বিষয়। আবার এক রকম সূক্ষ্ম চুরি আছে যাহা আত্মাকে নীচে নামাইয়া আনে, পতিত করিয়া রাখে—সে চুরি মানসিক চুরি। মন দ্বারা যখন কোন বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার উপর মলিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনই চুরি হয়। বড় অথবা ছোট যে কেহ যখন কোনও ভাল বস্তু দেখিয়া পাওয়ার লালসা করে, তখন মানসিক চুরি করা হয়। উপবাসী ব্যক্তি খায় না, কিন্তু সে যদি অপরকে খাইতে দেখিয়া মনে মনে স্বাদ লয়, তবে চুরি করে এবং উপবাস ব্রত ভঙ্গ করে। যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া উপবাস ভঙ্গ করার সময় কি খাইবে সে ব্যবস্থা ভাবে, সে অস্তেয়ও ভঙ্গ করে, উপবাসও ভঙ্গ করে—একথা বলা যায়। যে ব্যক্তি অস্তেয় পালন করিবে, সে ভবিষ্যতে কি পাইবে ইহা বিচার করিতে থাকিলে অস্তেয় ব্রত ভঙ্গ হয়। অনেক চুরির পশ্চাতেই এই মলিন ইচ্ছা আছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যাহা কেবল মনে মনে রহিয়াছে, উহার পাওয়ার সময় হইলে তখন ভাল মন্দ যে কোন উপায় ব্যবহার করিতেই লাগিয়া যাইব।

যেমন কোনও দ্রব্যের চুরি হয়, তেমনি ভাবেরও চুরি হয়। কোনও একটা ভাল চিন্তা নিজের মনে প্রথমে উৎপন্ন না হইলেও যে অহংকার বশতঃ উহা তাহারই আদি চিন্তা একথা বলে, সে ভাব চুরি করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনেক বিদ্বানও এই চুরি করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। মনে কর, আমি অন্ধ্র দেশে এক রকম নতুন রুটি দেখিয়া আসিলাম, তারপর আশ্রমে সেই রকম রুটি বানাইয়া বলিলাম যে, উহা আমার বুদ্ধিতেই করিয়াছি। ইহাতে আমি স্পষ্ট ভাবে অন্যের কৃত অনুসন্ধানের চুরি করিতেছি, আর অসত্য আচরণ ত করিতেছি বটেই।

সেইজন্য অস্তেয়-ব্রত পালনকারীকে খুব নম্র, খুব বিচারশীল, খুব সাবধান ও খুব সাদাসিধা থাকিতে হয়।

য়েরোড়া মন্দির
১৯-৮-৩০

অপরিগ্রহ

অপরিগ্রহ অস্তেয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যাহা গোড়ায় চুরি করা হয় নাই, তেমন দ্রব্য অনাবশ্যক হইলেও যদি সংগ্রহ করা হয়, তখন তাহা চুরির মতই হইয়া পড়ে। পরিগ্রহ মানে সঞ্চয় করা বা একত্র করা। যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী, যে অহিংস, সে পরিগ্রহ করিতে পারে না। পরমাত্মা পরিগ্রহ করেন না। তাঁহার যাহা 'আবশ্যক' তাহা তিনি প্রতিদিনই উৎপন্ন করেন। আর যদি আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখি তবে ইহাও বুঝিব যে, আমাদের আবশ্যকীয় বস্তু তিনি দিনের দিনই দিতেছেন ও দিবেন। যাঁহারা সরল, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ঈশ্বরের এই নিয়ম—এই প্রতিদিনের আবশ্যক প্রতিদিনই সংগ্রহ করার নিয়ম—জানি না, অথবা জানিয়াও পালন করি না, আর সেইজন্যই জগতে বৈষম্য ও তাহা হইতে উৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। ধনাঢ্য যে, সে তাহার অনাবশ্যক বস্তুদ্বারা নিজেকে ভরিয়া রাখিয়াছে, সেইজন্যই সে ঘুরিয়া মরিতেছে, নষ্ট পাইতেছে। আর এদিকে সেই বস্তুর অভাবে কোটি কোটি লোক ঘুরিয়া ফিরিতেছে, ক্ষুধায় মরিতেছে ও শীতে কাঁপিতেছে। সকলেই যদি নিজের আবশ্যক পরিমাণ সংগ্রহ করে, তবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না ও সকলেরই সন্তোষ থাকে। আজ ধনী ও দরিদ্র উভয়েই ক্লিষ্ট হইতেছে। যাহার ক্রোড় টাকা আছে, সে শত ক্রোড়পতি হইতে চায়—তাহাতেও সে সন্তোষ পায় না। কাঙ্গালও ক্রোড়পতি হওয়ার ইচ্ছা করে।

কাঙ্গালের পেট ভরিলেই যে সন্তোষ হইল, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কাঙ্গালের উদর পূরণ করার অধিকার আছে, আর সমাজের পক্ষে তাহাকে ততটুকু পাওয়াইয়া দেওয়াই ধর্ম। সেইজন্য, তাহাদের নিজের সন্তোষের জন্য ধনাঢ্যকেই প্রথমে এই ধর্ম আচরণ করিতে হয়। যদি ধনাঢ্যেরা তাহাদের অত্যন্ত পরিগ্রহ ত্যাগ করে, তবে কাঙ্গালের পেট ভরার মত বস্তু সহজেই মিলে ও উভয় পক্ষই সন্তোষের পাঠ শিক্ষা করে। আদর্শ ও আত্যন্তিক অপরিগ্রহ ত মনে ও দেহে দিগম্বর হইলে তবে লাভ করা যায়। সে তখন পক্ষীর ন্যায় গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও অন্নহীন হইয়া বিচরণ করিতে পারে। অন্ন তাহাকে নিত্যকার আবশ্যক মত ভগবান দিয়া থাকেন। এই অবধূতের অবস্থায় কদাচিৎ কেহ পঁহুছিতে পারেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ রকমের সত্যাগ্রহী, আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, প্রতিদিনই নিজেদের পরিগ্রহের

সন্ধান লইয়া যতটা পারি পরিগ্রহ কমাইয়া যাইতে পারি। সত্যকার সংস্কৃতি, সত্যকার সভ্যতার লক্ষণ পরিগ্রহ বাড়াইয়া যাওয়া নয়, বিচার করিয়া এবং ইচ্ছা করিয়া পরিগ্রহ কমাইয়া যাওয়া। যেমন যেমন পরিগ্রহ কমিতে থাকিবে, তেমন তেমন সত্যকার সুখ ও সত্যকার সন্তোষ বাড়িতে থাকিবে, সেবা-শক্তি বাড়িবে। এইভাবে বিচার করিয়া ও আচরণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, আশ্রমে এমন অনেক জিনিস সংগ্রহ করা আছে যাহা আবশ্যক বলিয়া বলা যায় না এবং এই প্রকার অনাবশ্যক পরিগ্রহ দ্বারা আমাদের প্রতিবেশীদিগকে চুরি করার প্রলোভনে ফেলি। অভ্যাস দ্বারা লোকের নিজের আবশ্যক কমাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং লোকে আবশ্যক যেমন কমাইতে থাকে, সেই পরিমাণে সুখী, শান্ত ও বেশি করিয়া স্বাস্থ্যশীল হইতে থাকে। কেবল সত্যের, কেবল আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তবে শরীরটাও একটা পরিগ্রহ। ভোগের ইচ্ছা হইতেই এই শরীরের জন্য আচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়াছি এবং শরীরকে টিকাইয়া রাখিতেছি। ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে শরীরের আবশ্যকতাও মিটিয়া যায়, আর মানুষের নতুন শরীরও ধারণ করিতে হয় না। আত্মা সর্বব্যাপক, শরীররূপী পিঞ্জরের ভিতর উহাকে পুরিবার আবশ্যক কি? এই পিঞ্জরকে টিকাইতে এত অনর্থই বা কেন করা এবং অন্যকে বা কেন হত্যা করা? এই বিচারের শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া আমরা আত্যন্তিক ত্যাগে গিয়া পঁহুছি এবং যতদিন শরীর থাকে ততদিন কেবল সেবার জন্যই উহার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি। এতদূর পর্যন্ত উহা করিতে পারি যে, দেহের সত্য খোরাক সেবা করাই হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মানুষ যে খায়-দায়, শোয় বসে, জাগে ঘুমায় সে সকলই সেবার জন্য করে। ইহা হইতে উৎপন্ন সুখই সত্য সুখ, আর এই উপায়েই মানুষ অবশেষে সত্যের দর্শন করিতে পারে। এই দৃষ্টিতেই যেন আমরা সকলে আমাদের পরিগ্রহের বিচার করিয়া লই।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যেমন বস্তুর অপরিগ্রহ করিতে হইবে তেমনি বিচারসমূহেরও অপরিগ্রহ করা চাই। যে ব্যক্তি নিজের মাথার ভিতর নিরর্থক জ্ঞান প্রবেশ করাইয়া রাখে, সে পরিগ্রহী। যে সকল বিচার আমাদিগকে ঈশ্বর-বিমুখ করিয়া রাখে, অথবা আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায় না, সে সকল বিচারই পরিগ্রহের ভিতর পড়িয়া যায় এবং সেই হেতু তাহা ত্যাজ্য।

ভগবান, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উহা দেখিয়া লইতে হয়। অমানিত্ব ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার বাহিরে যে জ্ঞান সে সকলই অজ্ঞান। যদি একথা সত্য হয়—আর ইহা ত সত্যই—তবে আজ অনেক কিছু যাহা আমরা জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সে সকল অজ্ঞান। উহাতে লাভের বদলে হানিই হয়। মাথা ঘুরিয়া যায় ও অবশেষে মাথা খালি হইয়া যায়, অসন্তোষ বিস্তৃত হয় এবং অনর্থ বাড়িয়া চলে। কিন্তু কেহ যেন একথা হইতে উদ্যমের শিথিলতা করা চাই—ইহা না বুঝে। আমাদের প্রতি মুহূর্তই কর্ম-প্রবৃত্তিময় হওয়া চাই। তবে সেই প্রবৃত্তি আবার সাত্ত্বিক হওয়া চাই, সত্যের অভিমুখী হওয়া চাই।

যে সেবা-ধর্ম স্বীকার করিয়াছে, সে এক মুহূর্তও কর্মহীন থাকিতে পারে না। এইজন্য অবশ্য ভাল মন্দ যে কি, সে বিচার-বুদ্ধি লাভ করা দরকার। যে সেবাপরায়ণ সে এই বিবেক সহজেই পাইয়া থাকে।

য়েরোড়া মন্দির
২৬-৮-৩০

অভয়

গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদের বর্ণনা করিতে গিয়া সর্ব প্রথমেই ভগবান অভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে যে, শ্লোক সাজাইবার জন্যই শব্দটি প্রথম স্থানে গিয়া পড়িয়াছে, হইতে পারে যে অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়ার জন্যই প্রথমে বসানো হইয়াছে। ইহা লইয়া আমার তর্ক করার আবশ্যক নাই। আর উহা নির্ণয় করার যোগ্যতাও আমার নাই। আমার বুদ্ধি অনুসারে অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অভয় না হইলে অন্য কোনও সম্পদ পাওয়া যায় না। অভয় না হইলে সত্যের অনুসন্ধান কেমন করিয়া করা যায়? ঈশ্বর লাভের পথ বীরের জন্যই, ভীরুর জন্য নহে। সত্যই হরি, সত্যই রাম, সত্যই নারায়ণ, সত্যই বাসুদেব। ভীরু যে সে ভয়ে ভীত, আর বীর যে সে ভয় মুক্ত, সে তলোয়ার আদি অস্ত্রে সজ্জিত নয়। তলোয়ার বীরত্বের ব্যঞ্জক নহে, ভীরুতারই চিহ্ন।

অভয় মানে সকল প্রকার বাহ্যিক ভয় হইতেই মুক্তি। ভয় ত মৃত্যুর ভয়, ধন মান লুণ্ঠিত হইবার ভয়, কুটুম্ব পরিবার সম্বন্ধে ভয়, রোগের ভয়, অস্ত্রাঘাতের ভয়, ইজ্জতের ভয়, কেহ ক্ষতি করিবে বলিয়া ভয়—এমনি করিয়া ভয়ের বংশাবলী যত ইচ্ছা বাড়াইয়া যাওয়া যায়। সাধারণতঃ একথা বলা হইয়া থাকে যে, একমাত্র মৃত্যুভয় জিতিলেই সমস্ত ভয় জয় করা যায়, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। অনেকে মৃত্যুভয় ছাড়ে তবুও নানা প্রকার দুঃখে নষ্ট পায়। কেহ বা নিজে মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয় পরিজনের বিয়োগ সহ্য করিতে পারে না। কেহ আত্মীয় কুটুম্বাদি সকলই আহুতি দিতে পারে, কিন্তু সঞ্চিত ধন ত্যাগ করিতে ভয় পাইয়া যায়। অনেকে নিজের গড়া আবরু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাও রক্ষা করার জন্য অনেক অকার্য কুকার্য করিতে প্রস্তুত হয় ও করে। লোকের নিন্দার ভয়ে কতজন সরল পথ জানিয়াও উহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে। যে সত্যের অনুসন্ধান করিবে, তাহার এই সর্বপ্রকার ভয়কেই তিলাঞ্জলি দিয়া তবে মুক্তি। নিজের ভিতর হইতে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠা চাই। হইতে পারে হরিশ্চন্দ্রের কথা কাল্পনিক, কিন্তু সমস্ত আত্মদর্শীরই উহাই অনুভব হয়। সেইজন্য এই হরিশ্চন্দ্রের কথার মূল্য যে কোনও ঐতিহাসিক কাহিনী অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক এবং আমাদের সকলের গ্রহণ করার, মনন করার যোগ্য।

এই ব্রতের সম্পূর্ণ পালন প্রায় অসম্ভব। যাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, কেবল সেই ত ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। অভয় হইতেছে মোহমুক্ত অবস্থার পরাকাষ্ঠা। সংকল্প দ্বারা, সর্বদা চেষ্টার দ্বারা, আত্মার উপরে শ্রদ্ধা বর্ধন দ্বারা অভয়ের মাত্রা বাড়ানো যায়। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমাদিগকে বাহিরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে, কিন্তু অন্তরে যে শত্রু রহিয়াছে তাহাকে ত ভয় করিয়াই চলিতে হইবে। কাম ক্রোধাদির ভয়, সত্যকার ভয়। উহাদিগকে জয় করিতে পারিলে বাহ্য ভয় আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। ভয় মাত্রই দেহের জন্য। দেহের উপর হইতে অনুরাগ যদি চলিয়া যায়, তবে সহজেই অভয় প্রাপ্তি ঘটে। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভয় মাত্রই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। যদি টাকা পয়সার জন্য, আত্মীয় পরিজনের জন্য, শরীরের জন্য এই মমত্ব বা "আমার আমার" বোধ দূর করা যায়, তাহা হইলে ভয়টা আর কোথায় থাকে? "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই বাক্য অব্যর্থ। আত্মীয় পরিবার, টাকা পয়সা

যেমন আছে থাকুক, কেবল উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা বদলাইতে হইবে। উহারা আমাদের নয়, উহারা আমার নয়, উহারা ঈশ্বরের, আমিও তাঁহারই, আমার বলিতে এই জগতে কিছু নাই, তবে আর আমার কিসের ভয় থাকিতে পারে? সেইজন্যই উপনিষদকার বলিয়াছেন, "উহা ত্যাগ করিয়াই, উহা ভোগ কর"। এই ভাবনা দ্বারা আমরা উহাদের মালিক না হইয়া কেবল রক্ষক হইয়া পড়ি। যাঁহার জন্য রক্ষা করিতেছি, তিনিই উহা রক্ষা করার উপযুক্ত শক্তি ও সামগ্রী দিয়া দিবেন।

এইভাবে যখন আমরা স্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া সেবক হইয়া যাই, শূন্যবৎ হইয়া যাই, তখন সহজেই সমস্ত ভয় জয় করি, সহজেই শান্তি প্রাপ্ত হই ও সত্য নারায়ণের দর্শন লাভ করি।

য়েরোড়া মন্দির

২-৯-৩০

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

এই ব্রত অস্বাদ-ব্রতের মত যেমন নতুন তেমনি কতকটা বিচিত্রও বটে। ইহা যত বিচিত্র হোক, ইহার আবশ্যকতা তদপেক্ষা বেশি। * * এই অস্পৃশ্যতা যেখানে সেখানে ধর্মের নাম লইয়া বা ধর্মের রূপ ধরিয়া বিঘ্ন ঘটাইতেছে ও ধর্মকে কলুষিত করিতেছে। যদি আত্মা এক হয়, ঈশ্বর এক হয়, তবে কেহই ত অস্পৃশ্য হইতে পারে না। যেমন মুচি মেথরকে অস্পৃশ্য গণ্য করা হইলেও তাহারা অস্পৃশ্য নহে, সেই বিচারেই মৃতদেহও অস্পৃশ্য নহে, উহা সম্মানের ও করুণার পাত্র। মৃতদেহকে স্পর্শ করিয়া, অথবা তেল মাখাইয়া, অথবা সাফ করিয়া যে স্নান করা হয়, সে কেবল স্বাস্থ্যের দৃষ্টি হইতে। যে ব্যক্তি মৃতদেহকে স্পর্শাদি করিয়া বা তেল লাগাইয়া স্নান না করে, তাহাকে অপরিচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সে পাতকী নয়, পাপী নয়। মা ছেলেপিলের মলাদি সাফ করিয়া যতক্ষণ স্নান না করে বা হাত-পা না ধোয় ততক্ষণ অস্পৃশ্য থাকে, কিন্তু ছেলে যদি খেলা করিতে করিতে আসিয়া মাকে ছোঁয় তবে সে অস্পৃশ্য হয় না, অথবা তাহার আত্মা মলিন হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে মুচি মেথর ইত্যাদি গ্লানিকর নামে পরিচিত করি, তাহারা ত জন্ম হইতেই অস্পৃশ্য।

সে বৎসরের পর বৎসর শত শত সাবান দিয়া শরীর সাফই করুক, বৈষ্ণবের পোষাকই পরুক, মালাকণ্ঠী ধারণই করুক, রোজ গীতাপাঠই করুক বা লেখকের ব্যবসাই নিক, তবুও সে অস্পৃশ্যই। ইহাকে যে বিশ্বাস ধর্ম বলিয়া মনে করে, বা আচরণ করে, তাহা ধর্ম-বিশ্বাস নয়, তাহা নাশ করার যোগ্য। আমরা অস্পৃশ্যতা-নিবারণ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া এই কথা মানিতেছি যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু ইহা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট পচনশীল পদার্থ, হিন্দুধর্মে প্রবিষ্ট একটা ভ্রম, একটা পাপ এবং উহা নিবারণ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহা পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যে সকল হিন্দু ধর্মের মর্ম বুঝেন, অন্ততঃ তাঁহাদের কর্তব্য, প্রত্যেক অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগ্নীকে আপনার করিয়া লওয়া, তাহাদিগকে আদরপূর্বক সেবাভাব হইতে স্পর্শ করা, স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম মনে করা, অস্পৃশ্যের দুঃখ দূর করা, বর্ষ বর্ষ ধরিয়া আমরা যে তাহাদিগকে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি, তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে যে অজ্ঞানাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা ধৈর্যের সহিত দূর করা, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং ঐরূপ করিতে অন্য হিন্দুদের অনুরোধ করা, অনুপ্রাণিত করা।

এই দিক দিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যদিগকে অস্পৃশ্যতামুক্ত করায় যে ঐহিক বা রাজনৈতিক লাভ আছে, তাহাকে ব্রতধারী তুচ্ছ গণ্য করিবে। ব্রতধারীর কার্য এই যে, উক্ত প্রকার ফল লাভ হোক আর নাই হোক, অস্পৃশ্যতা নিবারণকে ব্রতরূপে আচরণীয় ধর্ম মনে করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে আপনার জন করিয়া লওয়া। সত্যাদি ব্রত যখন আমরা পালন করি, তখন তাহার ঐহিক লাভ কি হয় তাহা দেখি না, সত্যাচরণ যুক্তি করিয়া করি না, উহাকে দেহের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা বস্তু বলিয়াই লই, উহা স্বভাব বলিয়াই লই; অস্পৃশ্যতা নিবারণও ব্রতধারীর কাছে তেমনি বস্তু। এই অস্পৃশ্যতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখিব যে, এই পচন কেবল যে মুচি মেথর বলিয়া যাহারা গণ্য তাহাদের সম্পর্কেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে। পচনের ধর্মই হইতেছে এই যে, প্রথমে উহা সরিষার দানার মত ছোট থাকে, পরে পর্বত-প্রমাণ হয় এবং যাহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ছাড়ে। অস্পৃশ্যতাও তেমনি। এই অস্পৃশ্যভাব বিধর্মীদের প্রতি আসে, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আসে, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া যায়। ইহা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে,

কতজন ত অস্পৃশ্যতাকে পালন করিতে করিতে পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে, নিজেকেই সম্বরণ করিয়া, সেবা যত্ন করিয়া, নিজেকেই ধুইয়া পুঁছিয়া, পানাহার করাইয়াই অবকাশ পায় না, ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরকে ভুলিয়া নিজেকেই পূজা করিতে লাগিয়া যায়। সেইজন্যই যাহারা অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-ব্রত পালন করিতে চায়, তাহারা কেবল মেথর ও চণ্ডালকেই আপনার করিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট হইবে না। যে পর্যন্ত প্রাণীমাত্রকেই নিজের মধ্যে আছে বলিয়া অনুভব না করিতেছ ও নিজেকে যতক্ষণ না জীবমাত্রের মধ্যেই সমর্পণ করিয়া দিতেছ, ততক্ষণ শান্তি পাইবে না। অস্পৃশ্যতা নিবারণ করিবে—মানে জগতের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিবে, জগতের সেবক হইবে। এই দিক দিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যতা নিবারণ অহিংসার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় এবং বস্তুতঃও তাহাই বটে। অহিংসা মানে জীবমাত্রের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেম। অস্পৃশ্যতা নিবারণেরও ইহাই অর্থ। জীবমাত্রের মধ্য হইতে ভেদ লোপ করাই অস্পৃশ্যতা নিবারণ।

এইভাবে অস্পৃশ্যতাকে দেখিলে এই দোষ জগতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর ব্যাপ্ত রহিয়াছে-দেখা যায়। এখানে আমরা অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের গলদরূপেই বিচার করিয়াছি, কেননা উহা হিন্দুধর্মে ধর্মের স্থান কাড়িয়া লইয়াছে, ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের অবস্থা ক্রীতদাসের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে।

য়েরোড়া মন্দির

৯—৯—৩০

কায়িক শ্রম

আমি টলষ্টয়ের একটা প্রবন্ধ পাঠ করি। উহাই আমাকে প্রথমে ঝাঁকুনি দিয়া জানাইয়া দেয় যে, নিজ হাতে কাজ করা মানুষের পক্ষে কেমন অনিবার্য। এত স্পষ্ট করিয়া একথা জানার পূর্বেও রাস্কিনের 'আন টু দিস্ লাস্ট' বইখানা পড়িয়া কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইংরেজীতে 'ব্রেড লেবার্' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপেই গুজরাটীতে "জাত-মেহনৎ" শব্দটা ব্যবহার করিতেছি। 'ব্রেড লেবার' শব্দের শব্দশঃ তরজমা হইতেছে, 'রুটির জন্য মজুরি'। নিজের পেটের ভাতের

জন্য যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই মজুরি করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম—এই কথাটা টলষ্টয়ের নিজের নহে, একজন খুব অপরিচিত রাশিয়ান লেখক বুর্নোর। তাঁহাকে টলষ্টয় প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও নিজের করিয়া লইয়াছেন। আমি এই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অযজ্ঞ, তাহার উপর এই কঠিন শাপ দেওয়া হইয়াছে যে,—"যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করিয়া খায়, সে চুরির অন্ন খায়।" এখানে যজ্ঞ অর্থে কায়িক শ্রম, অথবা রুটির জন্য মজুরি খাটা এবং আমার মতে ইহাই সম্ভব। সে যাহাই হোক, আমাদের এই ব্রতের উৎপত্তি এমনি করিয়াই হয়। বুদ্ধিও আমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দেয়। মজুরি না করিয়া খাওয়ার অধিকারটা কি? বাইবেল বলে—"তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তোমার রুটি উপার্জন করিয়া খাও।" যে ক্রোড়-পতি সে যদি শুধু খাটের উপরেই গড়াগড়ি করে, মুখে খাদ্য তুলিয়া দিলে তবে খায়, তাহা হইলে দীর্ঘ দিন আর সে খাইতে পারে না, সে তাহাতে তখন রস পায় না। সেইজন্যই সে ব্যায়ামাদি করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক করে এবং খাওয়ার সময়ও নিজের হাত চালাইয়াই খায়। ধনী নির্ধন সকলকেই যখন কোনও না কোনও রকম অঙ্গ-চালনা করিতেই হয়, তখন নিজের খাদ্য উৎপাদনের জন্য সকলেই বা শ্রম করিবে না কেন? এই প্রশ্ন সহজেই আসিয়া পড়ে। চাষাকেও হাওয়া খাইতে অথবা ব্যায়াম করিতে কেহ বলে না। দুনিয়ার কাজ চালাইতে শতকরা ৯০ জন লোকই ত কৃষি-কার্যেই নিযুক্ত আছে। বাকি দশজন আর জগতে কত সুখ, কত শান্তি, কত স্বাস্থ্য দিয়া থাকে? বুদ্ধিমান এই দশজন যদি কৃষকের সঙ্গেই থাকিত, তাহা হইলে অনেক দুর্গতি সহজেই দূর হইয়া যাইত। কায়িক শ্রমের এই নিঃসন্দেহ নিয়মকে যদি সকলেই মানিয়া চলে, তবে উচ্চ নীচ ভেদ উঠিয়া যায়। আজকাল যেখানে উচ্চ নীচের কোন গন্ধও নাই, সেখানেও ইহা বর্ণ-ব্যবস্থার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। মালিক মজুরের ভেদ সর্বব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং মজুর মালিককে ঈর্ষা করিতেছে। যদি সকলেই নিজের উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করে, তবে উচ্চ নীচ ভেদ উঠিয়া যায়। তারপর যে ধনিকবর্গ থাকিবে তাহারা নিজেকে মালিক মনে করিবে না, নিজেদিগকে কেবল ধনের রক্ষক অথবা ট্রাস্টি মনে করিবে এবং তাহার প্রধান ব্যবহার লোক-সেবার জন্যই করিবে। যে ব্যক্তিকে অহিংসা পালন করিতে হইবে,

সত্যের আরাধনা করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্যকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার কাছে ত কায়িক শ্রম অমোঘ অস্ত্র। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, কৃষি-কার্যের জন্য শ্রমই উদরান্নের জন্য কায়িক শ্রম। কিন্তু এখনকার অবস্থা এই যে, সকলেই তাহা করিতে পারে না। সেইজন্য কৃষিকার্য মনে মনে আদর্শ রাখিয়া লোকে তাহার পরিবর্তে অন্য কোনও কর্ম করিবে, যেমন—সুতা কাটা, তাঁত বুনা, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি। সকলকেই নিজ নিজ মেথর ত হইতেই হয়। খাইলে ত মলত্যাগ করিতে হইবেই। যদি মল-ত্যাগ করিতেই হয়, তবে নিজের মল নিজেই সাফ করিবে—ইহাই ত উত্তম। যেখানে ইহা না হয়, সেখানে এক পরিবার মিলিয়া নিজেদের এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। যেখানেই মেথর বলিয়া একটা ভিন্ন বৃত্তির কল্পনা হইয়াছে, সেইখানেই কতকগুলি মহাদোষ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কয়েক বৎসর হইতে আমার মনে হইতেছে। এই আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য-রক্ষকের কার্যকে কে প্রথম সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ স্থান দিয়াছিল, সে ইতিহাস আমাদের কাছে নাই। যে করিয়াছিল সে আমাদের উপকার করিয়া যায় নাই। বাল্যকাল হইতেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই ভাবনা দৃঢ় করা চাই যে, আমরা সকলেই মেথর। আর এই ভাবনা দৃঢ় করার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি ইহা বুঝিয়াছে, সে পায়খানা সাফ করা দ্বারাই কায়িক শ্রমের কার্য আরম্ভ করিবে। যদি জ্ঞানপূর্বক ইহা করা যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ ধর্মকে ভিন্নভাবে ও ঠিকমত বুঝিতে থাকিবে। বালক বৃদ্ধ অথবা রোগে যাহারা আতুর, তাহারা যদি কায়িক শ্রম না করে তবে দূষণীয় নয়। বালক ত তাহার মায়ের সামিল হইয়া থাকে। আর যদি নিয়ম ভঙ্গ না করা হয়, তবে বৃদ্ধ ও আতুর ত থাকিতেই পারে না, রোগীই বা তবে থাকে কোথা হইতে?

য়েরোড়া মন্দির
১৬-৯-৩০

সর্বধর্ম সমভাব—১

আমাদের ব্রতগুলির মধ্যে যাহার নাম সহিষ্ণুতা ছিল, তাহারই এই নতুন নাম দেওয়া হইয়াছে। সহিষ্ণুতা ইংরেজী 'টলারেশন' শব্দের অনুবাদ। উহা আমার পছন্দ হয় নাই, কিন্তু অন্য নামও খুঁজিয়া পাই নাই। কাকা

সাহেবেরও ঐ নামটা পছন্দ হয় নাই, তিনি 'সর্বধর্ম আদর' নামটা প্রস্তাব করেন। ইহাও ভাল লাগে না। অন্য ধর্ম সহ্য করার ভিতর, তাহার দ্বারা একটা লঘুত্ব যেন মানিয়া লওয়া হয়। "আদরের" ভিতর অনুগ্রহের ভাব আসে। অহিংসা আমাদিগকে অন্যের ধর্মের প্রতি সমভাব দেখাইতে শিক্ষা দেয়। 'আদর' অথবা 'সহিষ্ণুতা' শব্দ অহিংসার দৃষ্টিতে যোগ্য হয় না। অপর-ধর্মের প্রতি সমভাব রক্ষার ভিতর, নিজের ধর্মের অপূর্ণতার স্বীকার রহিয়া গিয়াছে। ইহাতেই সত্যের আরাধনা। অহিংসার কষ্টিপাথরও ইহাই শিক্ষা দেয়। যদি সম্পূর্ণ সত্যই আমরা দেখিতে পাই, তবে আর তাহার পর সত্যের আগ্রহ বলিয়া কি থাকে, নিজেই ত পরমেশ্বর হইয়া যাইব, কেননা আমরা জানিয়াছি যে, সত্যই পরমেশ্বর, আমরা পূর্ণ সত্য দেখিতে পাই না বলিয়াই সত্যের আগ্রহ রাখি, আর সেইজন্যই পুরুষার্থের অবকাশ থাকিয়া যায়। ইহাতে আমাদের অপূর্ণতার স্বীকার রহিয়াছে। যদি আমরা অপূর্ণ হই, তবে আমাদের কল্পিত ধর্মও অপূর্ণ। ধর্ম নিজে নিজে পূর্ণ, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না—যেমন আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আমরা যে ধর্ম মানি তাহা অপূর্ণ এবং তাহাতে নিত্যই পরিবর্তন হইতেছে, হওয়ার আবশ্যকও আছে। এই অবস্থায় আমরা উত্তরোত্তর উপরে উঠিতে পারি, সত্যের দিকে, ঈশ্বরের দিকে প্রতিদিনই অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি। আবার যদি আমরা মনুষ্য-কল্পিত সকল ধর্মই অপূর্ণ বলিয়া মানি, তবে তাহার মধ্যে উচ্চ নীচ মানিবার হেতু থাকে না। সকলই সত্য, কিন্তু সকলই অপূর্ণ, সেইজন্য দোষের পাত্র সমভাব হইলেও আমরা তাহার মধ্যে দোষ দেখিতে পারি, নিজের ধর্মেও দোষ দেখিয়া থাকি। এই দোষের জন্য তাহা ত্যাগ করি না, দোষ দূর করি। এইভাবে সমভাব রাখিয়া, যদি অপর ধর্মে কোনও কিছু গ্রহণ-যোগ্য থাকে, তবে তাহাকে নিজ ধর্মে স্থান দিতে সংকোচ আসে না, উপরন্তু ইহাতেই ধর্ম লাভ করা যায়।

তখন প্রশ্ন এই আসে যে, অনেক ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? অনেক ধর্ম আছে, তাহা আমরা জানি। আত্মা এক, কিন্তু মনুষ্য দেহ বহু। দেহের অসংখ্যতা দূর করা যায় না। তাহা হইলেও আত্মার একত্বের পরিচয় আমরা পাই। ধর্মের মূল এক—যেমন বৃক্ষের মূল এক, কিন্তু পাতা অসংখ্য। সকল ধর্মই ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু তাহা মনুষ্য-কল্পিত বলিয়া, মনুষ্য প্রচারিত বলিয়া অপূর্ণ। ঈশ্বর-দত্ত ধর্ম মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। ভাষায় মানুষ সেই কথা

ব্যবহার করে, তাহার অর্থও মানুষ করে, কিন্তু কোন অর্থ সত্য? সকলটাই নিজ নিজ দৃষ্টিতে, যতদূর দৃষ্টি পঁহুছে সে পর্যন্ত খাঁটি, কিন্তু সকলগুলিই মন্দ হওয়ায় অসম্ভব কিছুই নাই। সেইজন্যই আমরা সকল ধর্মের প্রতিই সমভাব রাখিব। ইহাতে নিজের ধর্মের প্রতি উদাসীনতা নাই, বরঞ্চ নিজের ধর্মের প্রতি আকর্ষণটা অন্ধ আকর্ষণ না হইয়া জ্ঞানময় হয় এবং সেইহেতু অধিক সাত্ত্বিক, অধিক নির্মল হয়। যদি সকল ধর্মের প্রতি সমভাব আসে, তবে আমাদের দিব্য চক্ষু খুলিয়া যাইবে। ধর্মান্ধতা ও দিব্য-দর্শন এই দুইয়ের মধ্যে উত্তর দক্ষিণের ন্যায় অন্তর রহিয়াছে। ধর্মজ্ঞান হওয়ায় অন্তরায় দূর হয় ও সমভাব উপস্থিত হয়। এই সমভাব শিক্ষাদ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের ধর্মের অধিকতর পরিচয় পাই।

ইহাতে ধর্ম ও অধর্মের ভেদ উঠাইয়া দেওয়া হইল না। এখানে ধর্ম বলিয়া আমরা যাহা জানি তাহারই কথা হইতেছে। এই সকল ধর্মের মধ্যেই মূল সিদ্ধান্ত এক রহিয়াছে। ঐ সকল ধর্মেই সাধু স্ত্রী পুরুষের উদ্ভব হইয়াছে, আজও হইতেছে আবার ধর্মের প্রতি সমভাবে এবং ধর্মীর প্রতি—মনুষ্যের প্রতি সমভাবে—প্রভেদ আছে। মনুষ্যমাত্রের প্রতি—দুষ্ট মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের প্রতি সমভাব রাখিতে হইবে, কিন্তু দুষ্ট ধর্ম ও অধর্মের প্রতি কদাচ নহে। এই বিষয়ে বিচার হয়ত আরও করিতে হইবে, যদি সহজে না বুঝিতে পার তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।

য়েরোড়া মন্দির

২৭-৯-৩০

সর্বধর্ম সমভাব—২

বিষয়টা এমন প্রয়োজনীয় যে, এখানে একটু বেশি করিয়াই বলিব। আমার কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি, তবে 'সমভাবের' অর্থ আরও স্পষ্ট হইবে। এখানকার মত ফিনিক্সেও প্রতিদিন প্রার্থনা হইত। সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ছিল। স্বর্গগত রোস্তমজী শেঠ, অথবা তাঁহার ছেলে অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন। "মনে ওহালু ওহালু দাদা রামজীনু নাম" এই গানটা শেঠ রোস্তমজীর বড়ই ভাল লাগিত। আমার স্মরণ হয় একসময়

ইহাতে মগনলাল, কি কাশী, কি অন্য সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়ে। রোস্তমজী শেঠ উল্লাসে বলিয়া উঠেন—" 'দাদা রামজীনের' বদলে 'দাদা হোরমজদজী' গাও না।" যাহারা শঙ্কিত ছিল, আর যাহারা গাইতেছিল, তাহারা এই কথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিল। তারপর হইতেই শেঠ রোস্তমজী উপস্থিত হইলে কয়েকবার করিয়া 'দাদা হোরমজদজীর' নাম-গান অবশ্যই হইত। স্বর্গগত দাউদ শেঠের ছেলে স্বর্গগত হুসেনও অনেক সময় আশ্রমে থাকিত ও উৎসাহের সহিত প্রার্থনায় যোগ দিত। সে নিজে বড় মিষ্ট স্বরে অর্গ্যান সহযোগে "যে বহার বাগ হুনিয়া চন্দ রোজ" গাহিত। আমাদের সকলকে সে এই ভজন শিখাইয়া দিয়াছিল ও প্রার্থনায় ইহা অনেকবার গান করা হইত। আমাদের এখনকার প্রার্থনা-মালায় তাহার স্থান রহিয়া গিয়াছে। উহা সত্যপ্রিয় হুসেনের স্মৃতি। হুসেনের অপেক্ষা অধিক সত্য-আচরণকারী যুবক আমি দেখি নাই। জোসেফ রায়পণ অনেকবার আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহার কাছে বৈষ্ণব ভজন খুব ভাল লাগিত। তিনি ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'বৈষ্ণব জন' এর স্থানে "খ্রীষ্টিয়ান জন তো তেনে কহিয়ে" এই প্রকার বদলাইয়া লইলেন। সকলে তখনই উহা ধরিয়া লইল। আমি দেখিতে পাইলাম জোসেফের অপার আনন্দ হইল।

আত্ম-সন্তোষের জন্য যখন আমি বিভিন্ন ধর্মপুস্তকগুলি পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম, তখন খ্রীষ্টীয়, ইসলাম, জোরস্ত্রী, ইহুদী ও হিন্দুধর্ম পুস্তকের সহিত আমি সন্তোষজনক পরিচয় করি। উহা করাতে আমার এই সকল ধর্মের প্রতি সমভাব উপস্থিত হয়, একথা বলিতে পারি। আমি একথা বলিতেছি না যে, সে সময় আমার এই জ্ঞান ছিল। তখন সমভাব শব্দের সহিত আমার পুরা পরিচয় হয় নাই। কিন্তু এই সময়কার স্মৃতি যদি এখন আবার নতুন করিয়া দেখি, তাহা হইলেও তখন ঐ সকল ধর্মের সম্বন্ধে সমালোচনা করার ইচ্ছা ছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। বরঞ্চ ঐ সকল পুস্তক ধর্ম পুস্তক বলিয়া আদর করিয়া পড়িতাম এবং উহাদের সকলের ভিতরেই মূল নৈতিক সিদ্ধান্ত একই প্রকারের দেখিতে পাইতাম। কোন কোন জিনিস আমি বুঝিতে পারিতাম না। আজও কতক বুঝিতে পারি না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে আমি একথা জানিয়াছি যে, আমরা নিজে যাহা বুঝিতে পারি না তাহাই যে খারাপ এ প্রকার ধারণা করা ভুল। যাহা পূর্বে

বুঝিতে পারি নাই এমন কোন কোন জিনিস আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়াছে। সমভাব শিক্ষা করার জন্য অনেক রহস্য নিজে নিজেই সাফ হইয়া গিয়াছে। যেখানে নিজেদের দোষ দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, সেখানে সেগুলি দেখাইতে যে নম্রতা ও বিবেকের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে কাহারও দুঃখ হয় না।

একটা অস্বস্তি হয়ত রহিয়া গিয়াছে। গতবারে আমি জানাইয়াছি যে, ধর্মে ও অধর্মে ভেদ আছে এবং অধর্মের প্রতি সমভাব রক্ষার শিক্ষা দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। তাহাই যদি হয়, তবে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিতে গিয়া কি সমভাবের শিকল ছিঁড়িয়া যাইবে না? এই প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উহা নির্ণয় করিতে ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের ভিতর অহিংসা বর্তমান থাকে, তবে আমরা বৈরভাব হইতে বাঁচিয়া যাইব। কেননা অধর্ম জানিলেও যাহারা সে অধর্ম আচরণ করিবে, তাহাদের প্রতি আমাদের প্রেমভাবই থাকিয়া যাইবে। আর তাহা হইলে কিছুই আসিবে যাইবে না। যদি সে আমাদের দৃষ্টি স্বীকার করে, অথবা আমাদের ভুল আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়, অথবা উভয়ের মতভেদ হয়, তবে তাহা সহ্য করিব। অন্তকালে যদি প্রতিপক্ষ অহিংস না হয়, তবে কঠোরতা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু আমরা যদি অহিংসার পূজারী হই, তবে আমাদের মৃদুতা কঠোরতাকে জয় করিবে—সে বিষয় সন্দেহ নাই। অপরের ভুলের জন্য তাহাদিগকে আমাদের পীড়া দেওয়া উচিত নয়। নিজেকেই পীড়া দিতে হয়—এই হইতেছে সুবর্ণ নিয়ম এবং ইহাদ্বারাই সমস্ত সংকট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

য়েরোড়া মন্দির।

৩০-৯-৩০

নম্রতা

ব্রতের মধ্যে ইহার ভিন্ন একটা স্থান নাই, থাকিতেও পারে না। অহিংসার সহিত ইহা একার্থবোধক, অথবা বলিতে পার ইহা অহিংসার ভিতরেই রহিয়াছে। কিন্তু নম্রতা শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা স্বভাবগত হইয়া পড়া চাই। যখন আশ্রমের নিয়মাবলী প্রথম গঠন করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুসাবিদা মিত্রবর্গের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। স্যার

গুরুদাস ব্যানার্জী নম্রতাকে ব্রতের মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্য জানাইয়াছিলেন। তখন ইহাকে ব্রত না করার যে কারণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম এখানে তাহাই লিখিব। কিন্তু উহা ব্রত না হইলেও ব্রত অপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক, ব্রতের সমান আবশ্যক ত বটেই। আবার নম্রতা অভ্যাস দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়ার বস্তু নহে। সত্য শিক্ষণীয়, দয়া শিক্ষণীয়, কিন্তু নম্রতা শিক্ষা করা মানে—দম্ভ শিক্ষা করা, একথা বলা যায়। এখানে নম্রতা বলিতে যাহা বড়রা একে অন্যের সম্মানের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা বুঝাইতেছে না। কেহ হয়ত কাহাকেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াও তাহার প্রতি মনে মনে তিরস্কারের ভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহা নম্রতা নয়, অসচ্চরিত্রতা। কেহ যদি রাম নাম লয়, জপ করে, মালা ফিরায়, মুনির মত গিয়া সমাজে বসে, কিন্তু মাথায় স্বার্থ ভরিয়া রাখে, তবে এমত ব্যক্তি নম্র নহে ভণ্ড। যে নম্র সে জানেও না যে, সে কখনও নম্র। আমরা সত্যাদির মাপ নিজেরা করিতে পারি, কিন্তু নম্রতার মাপ হইতে পারে না। স্বাভাবিক নম্রতা গুপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষ নিজে তাহা দেখিতে পায় না। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ঘটনা ত আমরা আশ্রমে অনেকবার বুঝিয়া লইয়াছি। আমরা নম্রতাকে শূন্যতার মত দেখিতে পারি। "আমি একটা কিছু" এই যে ভূত, ইহা মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত ব্রতই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যাহারা ব্রত পালন করে তাহারা যদি পালনের গর্ব মনে রাখে, তবে ব্রতের মূল্য খোয়াইয়া ফেলে, উপরন্তু সমাজে বিষের ন্যায় হইয়া পড়ে। সমাজ তাহাদের ব্রতের কোনও মূল্য দেয় না এবং তাহারা নিজেও সে ব্রতের ফল ভোগ করিতে পারে না। নম্রতা মানে অহং ভাবের একেবারে ক্ষয়। বিচার করিলে ইহা দেখা যায় যে, এই জগতে জীবমাত্রেই এক রজঃকণা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, শরীর ক্ষীণজীবী জিনিস মাত্র। কালের অনন্ত চক্রে শত বৎসরের মাপ করা যায় না। কিন্তু যে এই চক্রনেমী হইতে বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ 'কিছুই না' হইয়া যায়, সেই সম্পূর্ণরূপে থাকিয়া যায়। 'কিছু হওয়া' মানে, ঈশ্বর হইতে, পরমাত্মা হইতে, সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া। কিছু-পনা শেষ করিয়া দেওয়া মানে পরমাত্মায় মিশিয়া যাওয়া। সমুদ্রের মধ্যে যে জল-বিন্দু রহিয়াছে সে'সমুদ্রের মহত্ত্ব ভোগ করে, কিন্তু তাহার সে জ্ঞান নাই। বিন্দু যখন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও নিজত্ব দাবি করে, তদ্দণ্ডেই সে শুখাইয়া যায়। এই জীবনের সহিত আমি যে জল-বিন্দুর

উপমা দিতেছি তাহাতে আদৌ অতিশয়োক্তি করিতেছি না। এই প্রকার নম্রতা শিক্ষাদ্বারা কোথা হইতে আসিবে। কিন্তু ব্রতগুলি যদি ঠিক ঠিক বুঝা যায়, তবে নম্রতা নিজে নিজেই আসিতে থাকে। যে সত্য পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে অহংকারী কি করিয়া হইতে পারে? যে অপরের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিবে সে নিজের জন্য কোন স্থান আটকাইয়া রাখিতে পারে? যখন প্রাণ সমর্পণ করা স্থির করিয়াছে তখনই সে ত দেহটাকে ফেলিয়া দিয়াছে। এই নম্রতা আবার পুরুষার্থ শূন্য না হয়। এমন অর্থ হিন্দু-ধর্ম করিয়া ফেলিয়াছে সত্য এবং তাহাতে আলস্য ভণ্ডামি অনেক জায়গায় স্থান পাইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে নম্রতা তীব্রতম পুরুষার্থ। কিন্তু সে পুরুষার্থ সম্পূর্ণই পরমার্থের হেতু হয়। ঈশ্বর নিজে ২৪ ঘণ্টা এক নিঃশ্বাসে কর্ম করিতেছেন, একটু গা মোড়া দেওয়ার অবকাশও তাঁহার নাই। তাঁহাতেই মিশিয়া যাওয়া—তাঁহাতেই মিলিয়া যাওয়া মানে নিজের কর্ম-প্রচেষ্টা তাঁহার ন্যায় অতন্দ্রিত করা। তাহাই করিয়া ফেলা চাই। সমুদ্র হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে যে বিন্দু তাহার আরামের কল্পনা করিতে পার, কিন্তু যে বিন্দু সমুদ্রে রহিয়া গিয়াছে তাহার আরাম কোথায়? সমুদ্রের কি এক মুহূর্তও আরাম আছে? আমরাও ঠিক তেমনি ধারা। ঈশ্বররূপী সমুদ্রে যদি মিলিয়া যাই তবে আমাদের আরাম গেল, আরামের আবশ্যকতাও গেল। ইহাই বাস্তবিক আরাম, ইহাই মহাঅশান্তিতে শান্তি। সেইজন্য শুদ্ধ নম্রতা কেবল জীবমাত্রের সেবার জন্য সর্বার্পণের আশা রাখে। যাহার সব দিনই ছুটি, তাহার না আছে রবিবার, কি শুক্রবার, কি সোমবার। এই অবস্থার বর্ণনা করা মুশকিল ইহা অনুভব করার বিষয়। যে সর্বার্পণ করিয়াছে সেই, এই অনুভব পরায়ণ। আমরা সকলেই এই অনুভব লাভ করিতে পারি, সেই অনুভব লাভের ইচ্ছাতেই আশ্রমে মিলিত হইয়াছি। সকল ব্রত, সকল প্রবৃত্তি সেই এক অনুভবের জন্য। এক দুই তিন—এমনি গুণিতে গুণিতে এক দিন উহা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। ইহা খুঁজিয়া পাওয়ার জিনিস নয়।

ব্রতের আবশ্যকতা

ব্রতের মহত্ত্ব বিষয়ে এক আধটুকু আমি এই লেখা-মালায় লিখিয়া গিয়াছি। কিন্তু জীবনকে সুগঠিত করার জন্য ব্রতের আবশ্যকতা কতটা, তাহা বিচার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। স্বদেশী ব্যতীত আমাদের অন্য ব্রতগুলি সম্বন্ধে লেখা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ব্রতের আবশ্যকতা বিষয়ে বিচার করিব। এমন এক সম্প্রদায় আছেন, আর সে সম্প্রদায় বেশ প্রবল, যাঁহারা বলেন, "অমুক নিয়ম পালন করা উচিত, কিন্তু সে সম্বন্ধে ব্রত লওয়ার আবশ্যকতা নাই, বরঞ্চ উহাতে মনের দুর্বলতাই সূচিত করে এবং উহাতে ক্ষতিও হয়। ব্রত লওয়ার পর নিয়ম পালনে যদি অসুবিধা হয়, অথবা নিয়ম পালন করা পাপ বলিয়া মনে হয়, তখনও যে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে ইহা অসহ্য।" তাঁহারা বলেন—"উদাহরণ হিসাবে মদ না খাওয়া' ভাল, কিন্তু যদি দুই একবার খাওয়া যায় তাহা হইলে ক্ষতিই বা কি? ঔষধ বলিয়া প্রয়োজন হইলে ত খাওয়াই দরকার। সুতরাং এই যে মদ না খাওয়ার ব্রত, ইহা ত গলায় একটা শিকল পরার সমান। মদের বেলায় যেমন অন্য বিষয়েও ঠিক তেমনি, আর ভালোর জন্য অসত্যই বা কেন না বলিব?" কিন্তু এই সকল যুক্তির ভিত্তি নাই। ব্রত মানে অটল সংকল্প। অসুবিধা উল্লঙ্ঘন করার জন্যই ব্রত সমূহের আবশ্যকতা। অসুবিধা সহ্য করিয়াও যাহা ভাঙ্গা যায় না, তাহাই অটল সংকল্প। সারা জগত এই সাক্ষী দিতেছে যে, এই প্রকার সংকল্প ব্যতীত মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে না। যাহা পাপময় তাহা করার নিশ্চয় সংকল্পকে ব্রত বলা যায় না। উহা রাক্ষসী বৃত্তি। যদি কোনও সংকল্প পাপময় বলিয়া জানা যায়, পাপময় বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে উহা ত্যাগ করাই ধর্ম। কিন্তু ঐ প্রকার বিষয়ে কেহ ব্রত লয় না, লওয়াও উচিত নয়। যাহা সর্বমান্য ধর্ম বলিয়া গণ্য এবং যাহা আচরণ করার অভ্যাস আমাদের নাই, সেই সম্বন্ধেই ব্রত লওয়া চলে। উপরের দৃষ্টান্তে পাপের আভাসমাত্র রহিয়াছে। "সত্য বলিলে কাহারও হানি হইতে পারে ত?" —সত্যবাদী এ প্রকার বিচার করিতে বসে না। সত্যবাদী বিশ্বাস করে যে, সত্যদ্বারা কাহারও হানি হয় না, হইতেও পারে না। তেমনি মদ্যপান সম্বন্ধেও বলা যায়। ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহারে বাধা দেওয়া হোক আর নাই হোক, এই ব্রতের সংকল্প শরীরকে বিপদ-মুক্ত রাখার ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঔষধ হিসাবেও যদি মদ না খাওয়ায় দেহ নষ্ট হয়, তাহা

হইলেই বা ক্ষতি কি? মদ খাইলেই যে দেহ থাকিবে, এমন পাট্টা কে লিখিয়া দিতে পারে? তখন যদি দেহ টিকিয়া পরক্ষণেই অন্য কারণে যায়, তবে তাহার দায়িত্বই বা কে লইয়া থাকে? আবার বিপরীত দিকে, মরিয়া গেলেও তবু মদ না খাওয়ার দৃষ্টান্তের কি চমৎকার প্রভাব, যাহারা মদ খাওয়ার বদ অভ্যাসে পড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরে দেখা যায়! উহাতে জগতেরই না কত উপকার হয়! দেহ যাক বা থাক, আমার ধর্ম পালন করিতেই হইবে এই প্রকার সাধু সংকল্প যে রাখে, সে কোনও না কোনও দিন ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারে। ব্রত লওয়া দুর্বলতার পরিচয় নহে, উহা বলেরই সূচনা করে। কোন একটা কাজ যদি করা উচিত হয়, তবে তাহা করাই চাই, ইহারই নাম ব্রত, আর ইহাতেই শক্তি আছে। ইহাকে ব্রত নাম না দিয়া অন্য নাম দেওয়ায় ক্ষতি নাই। কিন্তু "যতটা পারি করিব" একথা যে বলে, সে নিজের দুর্বলতার অথবা অভিমানের পরিচয় দেয়। সে ইহাকে যদি নম্রতার নামেই পরিচয় দিতে চায় ত দিক, কিন্তু উহাতে নম্রতার গন্ধ পর্যন্ত নাই। শুভ সংকল্প সম্বন্ধে "যতটা পারি" এই রকম বাক্য বিষের ন্যায়, ইহাই আমি নিজের জীবনে ও অনেকের জীবনে দেখিয়াছি। "যতটা পারি করিব" মানে, প্রথম অসুবিধার মুখেই পতন স্বীকার করা। "যতটা পারি সত্য পালন করিব" এমন বাক্যের মানেই থাকে না। ব্যবসার ভিতর কখনও এমন হুণ্ডি চলে না যে, "যদি পারি তবে অমুক তারিখে এত টাকা দিব।" তেমনি "যতটা সম্ভব সত্য পালন করিব" এই প্রকার হুণ্ডি ঈশ্বরের দোকানে ভাঙ্গানো যায় না।

ঈশ্বর নিজেই নিশ্চয় সংকল্প-স্বরূপ এবং ব্রতের পূর্ণ মূর্তি-স্বরূপ। তাঁহার নিয়মের যদি একচুলও পরিবর্তন হয়, তবে ঈশ্বরত্ব শেষ হয়। সূর্য মহাব্রতধারী সেইজন্য জগতে কাল সৃষ্টি হইয়াছে ও শুদ্ধ পঞ্জিকা তৈয়ারি হইতে পারিতেছে। সূর্য প্রতিদিন উঠিতেছে এবং প্রতিজ্ঞা লইয়া রাখিয়াছে যে, সে প্রতিদিন উঠিবে এবং সেইজন্যই আমরা নিজেদিগকে সুরক্ষিত মনে করি।

ব্যবসা মাত্রই সংকল্প স্থির রাখার আশ্রয় অবলম্বনে চলিতেছে। ব্যবসায়ীরা যদি একে অপরের সহিত বন্ধন না রাখে, তবে ব্যবসা চলে না। এইভাবে ব্রত যে সর্বব্যাপক জিনিস তাহা আমরা দেখিতে পাই। অতএব যখন আমাদের নিজেদের জীবন নিয়মে বন্ধন করিবার প্রশ্ন উঠে, ঈশ্বর দর্শন

করার প্রশ্ন উঠে, তখন ব্রত না লইলে চলিবে কি করিয়া? ব্রতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা যেন কখনো মনে সন্দেহ না রাখি।

স্বদেশী

এই প্রকরণে স্বদেশী সম্বন্ধে লেখা বর্জন করিলাম। রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু না লেখার সংকল্প আছে, ইহাতে সে সংকল্পে আঘাত লাগিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। স্বদেশীর কেবল ধার্মিক দিকটা লিখিতে গেলেও এমন কিছু লিখিতে হয়, যাহা রাজনীতির সহিত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত।

ধর্মনীতি

মূল প্রস্তাবনা

আজকাল দুনিয়ায় ভণ্ডামি বাড়িয়া গিয়াছে। যে ধর্মের লোকই হোক না কেন, ধর্মের বাহিক রূপ মাত্র বিচার করে। নিজের যথার্থ কর্তব্য ভুলিয়া যায়। অর্থ উপার্জনের অত্যধিক পূজা করার জন্য, অপরের তাহাতে কি দুঃখ হইতে পারে তাহা দেখে না, অথবা দুঃখ হইবে দেখিয়াও তাহা গ্রাহ্য করে না। অত্যন্ত কোমল ছোট ছোট প্রাণী বধ করিয়া যে কোমল মোজা প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যবহার করিতে ইউরোপের অবলারা এতটুকুও দ্বিধা করেন না। মিঃ রকফেলার পৃথিবীর প্রধানতম ধনীদের মধ্যে একজন। তিনি অর্থ উপার্জন করিতে নীতির অনেক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকেন—একথা জগৎ-প্রসিদ্ধ। যদি এমনি চারিদিকে তাকাই তবে দেখিব যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে ধর্মের বিরোধী হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, পৃথিবীতে যদি কোনও ধর্ম থাকিত, তবে যে অন্যায় আচার বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বাড়িত না। কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্ত। মানুষ সর্বদাই অভ্যাস বশতঃ নিজের দোষ না দেখিয়া হাতিয়ারের দোষ দিয়া থাকে। তাহারা নিজের দোষের বিচার না করিয়া, ধর্মটাই

খারাপ এই প্রকার বিচার করে বলিয়া, স্বচ্ছন্দমনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে ও বলিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকাল অনেকে মনে করিতেছেন যে, এইভাবে সমস্ত ধর্মের নাশ হইলে পৃথিবীর মহা ক্ষতি হইবে ও লোকে সৎপথ পরিত্যাগ করিবে। তাঁহারা এই ভাবনা হইতে লোককে নীতির বশে আনিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। একটা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, যে সমিতি সকল ধর্মই যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, নীতিশিক্ষা দিয়া থাকে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, লোকে কোনও বিশেষ ধর্ম মানুক আর নাই মানুক, যদি নীতির নিয়মও পালন না করে, তবে ইহলোকে অথবা পরলোকে, নিজের বা পরের ভাল করিতে পারিবে না। যাহারা ধর্ম-বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া সকল ধর্মকেই মন্দ বলিয়া মনে করে, তাহাদের যুক্তির উত্তর দেওয়ার জন্যই এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা সকল ধর্মের সার বাহির করিয়া উহা হইতে কেবল নীতিরই চর্চা করিয়া থাকেন। এই মতকে তাঁহারা নীতিধর্ম অথবা 'এথিকাল রিলিজিয়ন' নাম দিয়াছেন। কোনও ধর্মমত খণ্ডন করা এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য নয়। যে কোনও ধর্মের লোক এই সমিতিভুক্ত হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন। এই সমিতি হইতে লাভ হয় এই যে, যিনি ইহাতে প্রবেশ করেন তিনি নিজের ধর্মে বেশি করিয়া দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন এবং উহাতে যে নীতির শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন। তাঁহারা ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, লোকের নীতির নিয়ম পালন করা উচিত। যদি তাহা না করা হয়, তবে পৃথিবীতে সমাজ-বন্ধন থাকিতে পারে না এবং পৃথিবীর পরম অনিষ্ট হয়। মিঃ সলটার নামে আমেরিকায় একজন বিদ্বান ভদ্রলোক আছেন, তিনি একখানা সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে আদৌ ধর্ম-চর্চা নাই। সকল লোকেই উহা বুঝিতে পারিবে। বর্তমান পুস্তকখানার লেখকের সম্বন্ধে এই কথা বলা আবশ্যক যে, যাহা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইতেছে তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া থাকেন। আমি পাঠকদের নিকট এই নিবেদন করি যে, যদি ইহার কোনও নীতিবাক্য তাঁহাদের ভাল লাগে, তাহা হইলে সেই অনুযায়ী আচরণ করার যতটা চেষ্টা করিবেন আমার প্রযত্ন সেই পরিমাণে সার্থক জ্ঞান করিব।

আরম্ভ

আমরা যে সৎ বিচার করিতে পারি, তাহা আমাদের নীতি পালন করার ফল বলিয়াই জানিতে হইবে। পৃথিবীর সাধারণ শাস্ত্র, পৃথিবী কেমন এই কথাই বলে। আর নীতিশাস্ত্র বলে—পৃথিবী কেমন হওয়া উচিত। নীতিমার্গ দ্বারা লোকের কেমন আচরণ করা উচিত, তাহা সে জানিতে পারে। মানুষের মনের ভিতর দুইটা দৃষ্টি আছে। একটা দিয়া সে নিজে কেমন তাহা দেখিতে পারে, আর দ্বিতীয়টা দ্বারা তাহার কি হওয়া উচিত সে দৃষ্টি পাইতে পারে। শরীর, বুদ্ধি ও মন এই সকল আলাদা আলাদা করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমাদের কাজ, কিন্তু যদি সেখানেই থামিয়াই যাই, তবে ঐ প্রকার জ্ঞান পাইয়াও কোন লাভ হইবে না—আমরা অন্যায়, হীনতা ও অভিমান ইত্যাদির পরিণাম হইতে বাঁচিব না। যেখানে এই তিন বস্তু আছে, সেখানে যে কি ক্ষতি হয় তাহা জানা দরকার। কেবল জানাই যথেষ্ট নয়, জানিয়া সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। নীতির বিচার গৃহনির্মাণে শিল্পীর নক্সার মত। সে নক্সা, ঘর কেমন তৈরি করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেয়। যেমন ঘর না গাঁথিলে নক্সা কোনও কাজে আসে না, তেমনি নীতি বিচার অনুযায়ী আচরণ না করিলে সে বিচারও নিরর্থক হয়। অনেক লোক নীতির বিচার স্মরণ করিয়া সে বিষয়ে বক্তৃতাও করিয়া থাকে, কিন্তু সে অনুযায়ী চলে না, চলিতে চায় না। কেহ কেহ আবার এই প্রকার ভাবেন যে, নীতির বিচার মান্য করিয়া চলা ইহ সংসারে হইবে না, পরলোকে হইবে। এই প্রকার যুক্তি কিছু প্রশংসনীয় নহে। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, যদি সম্পূর্ণ হইতে হয়, তবে আজ হইতেই যত দুঃখ হোক তাহা সহ্য করিয়া নীতি অনুযায়ী আচরণ করিতে হয়। এই প্রকার বিচার হইতে যেন আমরা ভয় না পাই। আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়া সেই অনুযায়ী আচরণ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বড় যোদ্ধা পেমব্রোক যখন ওবেকির যুদ্ধকালে যুদ্ধের সম্পর্কে আর্ল ডারবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন আর্ল ডারবী তাঁহাকে খবর দেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে। এই খবর পাইয়া পেমব্রোক বলিয়া উঠেন যে—"আপনি আমার প্রতি বিনয়োচিত ব্যবহার করেন নাই। আমি যে সম্মান পাইতাম, তাহা আপনি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। আপনি আমাকে ডাকিলেনও, আবার আমার আসার পূর্বে যুদ্ধই শেষ হইয়া গেল।"

এই প্রকার দায়িত্ব লওয়ার আকাঙ্ক্ষা লোকে যখন নীতিমার্গে থাকার জন্য করে, তখন সে নীতি-পথেই চলে।

খোদা অথবা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁহার দয়া, তাঁহার ন্যায় অসীম। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাঁহার দাস হইয়া নীতিমার্গ কেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি? নীতি অনুযায়ী আচরণকারী যে বিফল হয় তাহাতে নীতির কোন দোষ নাই, যাহারা নীতি ভঙ্গ করে তাহারাই নীতির উপর দোষারোপ করে।

নীতিমার্গে নীতি-পথ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিদান পাওয়ার কথা আসেই না। লোকে যে ভাল কাজ করে তাহা বাহাদুরি পাওয়ার জন্য নয়, ভাল না করিয়া সে থাকিতেই পারে না সেইজন্য। খাদ্য ও সদ্ব্যবহার এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিলে সদ্ব্যবহারকেই উচ্চ শ্রেণীর খোরাক বলা যায়। যে ব্যক্তি ভাল করিতে চায়, তাহার যখন কোন ভাল কিছু করার অবকাশ উপস্থিত হয় তখন সে অবকাশদাতাকে ধন্যবাদ দেয়, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দিলে যেমন সে ধন্যবাদ দেয়—এও তেমনি।

যাহারা উপরে উপরে দেখিবে এই প্রকার নীতিমার্গের সার গ্রহণ তাহারা করিতে পারিবে না। এই নীতি-পথ অবলম্বন করিতে আমাদের অধিক শ্রম-পরায়ণ হইতে হইবে, অধিক শিক্ষা লইতে হইবে, অধিক পবিত্র হইতে হইবে, ইত্যাদি। ইহাই যথেষ্ট নয়, ইহা ত নীতির সাধারণ গণ্ডির মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ইহা ভিন্নও সমস্ত কিছুই এই মার্গে থাকিয়া করিয়া যাইতে হইবে। স্বভাবই ঐ প্রকার করা চাই, ইহাই বুঝিয়া করিতে হইবে—উহা হইতে কি লাভ হইবে সে চিন্তা মোটেই থাকিবে না।

উত্তম নীতি

নীতি-বিষয়ে প্রচলিত ধারণা খুব উচ্চ নয় বলা যায়। কেহ কেহ এ প্রকার মনে করেন যে, নীতির বিশেষ আবশ্যক নাই। আর কেহ কেহ এ প্রকারও মনে করেন যে, ধর্মের ও নীতির মধ্যে সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ধর্মগুলির খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে, নীতি ব্যতীত ধর্ম চলিতেই পারে না। যথার্থ নীতির ভিতর অনেক সময়ই ধর্মের সমাবেশ হইয়া যায়। যাহারা নীতির জন্যই নীতির নিয়ম পালন করে, স্বার্থবশে নয়, তাহাদিগকে ধার্মিক

বলা হয়। রাশিয়াতে এমন লোক আছেন যাঁহারা দেশের ভালর জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, এই প্রকার লোককে নীতি-পরায়ণ বলা যায়। জেরেমী বেথাম একজন ইংরেজ। তিনি ইংলণ্ডের জন্য ভাল আইন গঠন করিয়া গিয়াছেন, তিনি ইংরেজদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তিনি কয়েদীদের অবস্থা ভাল করার জন্য খুব কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে নীতি-পরায়ণ বলা যায়।

যথার্থ নীতির নিয়ম ত এই যে, আমরা জানিয়া শুনিয়া যে নীতি-পালন করিব তাহাই যথেষ্ট নহে, জানিয়া, না জানিয়া, যাহা নীতি-পথ তাহাই অবলম্বন করাই নীতি-পথে চলা। অর্থাৎ যখন আমরা জানি যে অমুকটা নীতি-পথ, তখন নির্ভয় হইয়া তাহা গ্রহণ করাই নীতি-রক্ষা করা, আর তাহা হইলে আমরা এই পথে উন্নতি করিতে পারি। এইভাবেই নীতির সহিত যথার্থ সভ্যতা, যথার্থ মহত্ত্ব একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের নিজেদের ভিতর যদি অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব যে, যে দ্রব্য আমাদের আছে তাহা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাহা নাই তাহাই সর্বদা অধিক মূল্যবান মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ইচ্ছা ত দুই প্রকারের— এক হইতেছে নিজের স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা, এই ইচ্ছা মিটাইবার চেষ্টার নাম অনীতি বা দুর্নীতি, আর অন্য প্রকারের ইচ্ছা, যাহাতে নিজের কল্যাণ হয় ও অপরের কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা হয়। আমরা যে ভাল কাজ করি তাহা লইয়া কখনও অহংকৃত হইতে নাই, উহার মূল্য আমাদের নিজেদের ধরিতে নাই, কেবল আরও বেশি ভাল হওয়ার, আরও বেশি ভাল করার ইচ্ছা নিরন্তর করিয়া যাইতে হইবে। এই ইচ্ছা মিটাইবার চেষ্টার নাম যথার্থ নীতি। আমাদের কাছে যদি কোনও সম্পত্তি না থাকে, তবে তাহাতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু যদি সম্পদ থাকে, তবে তাহার অপব্যবহার করায়, তাহা অসৎ কাজে ব্যয় করায় নীতিমার্গ ত্যাগ করা হয়। কর্তব্যপালনের ভিতরেই নীতির পালন রহিয়া গিয়াছে। এই প্রকার নীতির যে আবশ্যকতা আছে, তাহা কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারি। যে সমাজ অথবা পরিবারের ভিতর অনীতির বীজ প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে অন্যায় ও অসত্য দেখা দিয়াছে, সে পরিবার নষ্ট পায়। যদি ব্যবসা ও রোজগারের উপায়ের কথা ধরা যায়, তবে আমরা দেখিব যে, এমন একজন লোকও দেখা

যায় না যে বলে—সত্য পালন করিবে না। ন্যায় ও সততার প্রভাব বাহিরের জিনিস নহে, উহা অন্তরের জিনিস। চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপে অন্যায় ও অসত্য প্রবল ছিল। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, লোকে মুহূর্তও শান্তিতে থাকিতে পারিত না। ইহা হওয়ার কারণ এই যে, লোকের ভিতর নীতি ছিল না। সমস্ত নীতির নিয়ম যদি দোহন করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, লোকের যাহাতে ভাল হয় তাহা করাই উচ্চ নীতি। এই চাবিদ্বারা নীতির তোরঙ্গ যদি খুলিয়া ফেলা যায়, তবে তাহার ভিতর নীতির অন্য সমস্ত নিয়মই পাওয়া যাইবে।

এই প্রবন্ধগুলির শেষে আমি গুজরাটী ও উর্দু কবিদের নীতি-সম্পর্কীয় কাব্য বা নীতির নিয়মের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত কবিতা তুলিয়া দিব। উহাতে সকল পাঠকই লাভবান হইতে পারিবেন ও আমাদের যুবক পাঠকেরা উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে পারিবেন। প্রথমটা মিঃ মালবারীর পুস্তক "আদম ও দুনিয়া" হইতে লওয়া।

নীতি-অনুমোদিত কার্য কি

কোন কাজকে নীতি-অনুমোদিত বলা যায়? এই প্রশ্ন তুলিয়া নীতি ও অনীতিপূর্ণ কার্যের তুলনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, কিন্তু কেমন করিয়া নীতি-পরায়ণ হওয়া যায় তাহাই বিচার করিতে চাই। আমাদের কাজের ভিতরেই নিশ্চিত নীতির সমাবেশ হয় না। অনেক সময়েই আমরা সাধারণ রীতি, রেওয়াজ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি। এইরূপ গতানুগতিক ভাবে চলা অনেক সময় আবশ্যক। এই গতানুগত্যের নিয়ম পালন না করিলে অন্ধভাবে গোলক ধাঁধায় পড়া হইবে ও দুনিয়ার কারবার অচল হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, গতানুগতিক ভাবে চলাই নীতিপালন করা—একথাও ঠিক নয়।

নীতি-অনুমোদিত কার্য নিজের করা চাই, নিজের ইচ্ছায় করা চাই। যে পর্যন্ত যন্ত্রবৎ কার্য করা যায়, সে পর্যন্ত আমাদের কার্যের ভিতর নীতি ফুটিয়া উঠে না। আমরা যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া থাকি, করিতে হয়। ইহা নীতি-অনুমোদিত। কেননা ইহাতে আমরা বিবেক বুদ্ধির ব্যবহার করিয়া থাকি। এই যন্ত্রবৎ কার্য করা ও সেই কার্য করার বিচার করার মধ্যে

যে ভেদ আছে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। রাজা যদি কাহারও অপরাধ মাফ করেন, তবে তাহা নীতি-সম্মত হইতে পারে। মাফ করার আজ্ঞা-পত্র লইয়া যে চাপরাসী যায় তাহার, রাজার কৃতকার্যে যন্ত্রবৎ অংশ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু চাপরাসীর পক্ষে চিঠি লইয়া যাওয়াই তাহার কর্তব্য —এই জ্ঞানে সে চিঠি লইয়া যায় এবং তাহার এই কার্য নীতি-সম্মত বলা যায়। যে ব্যক্তি বুদ্ধি বা মাথা খাটায় না, যে কাঠের মত কুঁদের উপর ঘুরিতে থাকে, সে নীতির কথা কি বুঝিবে? কখন কখন গতানুগতিকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরমার্থ লাভের ইচ্ছায় লোকে কাজ করে। সেই রকম একজন ছিলেন মহাবীর ওয়েণ্ডল ফিলিপ্স। তিনি বক্তৃতাকালে একবার বলেন—"যে পর্যন্ত তোমরা নিজের সম্বন্ধে বিচার করিতে ও জানিতে শিখিবে না, সে পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে কি মনে কর সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।" এইভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের অন্তর কি বলে তাহাই জানা দরকার, আর তাহা হইলেই আমরা নীতি-পথে চলিব বলা যায়। যে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে অন্তর্যামী এবং আমাদের সকল কার্যের সাক্ষী বলিয়া না মনে করিব, না অনুভব করিব, সে পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থা পাওয়া সম্ভব নয়।

এইভাবে কৃত কর্ম যে ভাল তাহাই যথেষ্ট নয়, উপরন্তু ঐ কার্য নিজে ভাল করিতে চাই বলিয়াই ইচ্ছাপূর্বক করা চাই। অর্থাৎ কোনও কর্ম নীতি-সম্মত কিনা, তাহা নির্ভর করে যে কর্তা তাহার ইচ্ছার উপর। একই কার্য যদি দুইজনে করে, তবুও তাহার মধ্যে একজনের কার্য নীতি-সম্মত ও অপরের কার্য নীতি-বিগর্হিত হইতে পারে। যেমন ধরুন, একজন লোক খুব দয়ার বশবর্তী হইয়া গরিবদিগকে খাওয়াইতেছে, আর অপরে সম্মান পাওয়ার জন্য অথবা অমনি স্বার্থ-যুক্ত কোনও ইচ্ছা হইতে ঐ কার্যই করিতেছে। উভয়ের কার্য এক হইলেও প্রথমের কার্য নীতি-সম্মত ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য নীতি-বিগর্হিত বলা যায়। এইভাবেই পাঠককে নীতি-সম্মত ও নীতি-বিগর্হিত এই দুই কার্যের ভিতর যে ভেদ আছে তাহার খেয়াল রাখিতে হইবে। এমন হইতে পারে যে, নীতি-সম্মত কার্যের প্রভাব সকল সময় ভাল হইল না। নীতি-সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের দেখিতে হইবে যে, কৃত-কর্ম শুভ কিনা ও শুদ্ধ ইচ্ছা হইতে করা কিনা। উহার ফল কি হইবে তাহার উপর আমাদের হাত নাই।

ফলদাতা একমাত্র ঈশ্বর। সম্রাট আলেকজেণ্ডারকে ঐতিহাসিকেরা মহান বলিয়া গণ্য করেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেই সেই স্থানেই গ্রীক শিক্ষা শিল্প ও রীতি প্রচলিত করাইয়াছেন। তাহার ফল আমরা ভালই হইয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এ সকল করার হেতু নিজে বড় হওয়া যে নয়, তাঁহার কাজ যে নীতি-সম্মত—একথা কে বলিতে পারে? তাঁহাকে বড় বলা যায়, কিন্তু নীতি-পরায়ণ বলা যায় না। উল্লিখিত যুক্তি অনুযায়ী একথা সিদ্ধ হইল যে, নীতি-সম্মত প্রত্যেক কার্য যে কেবল শুদ্ধ ইচ্ছা হইতে করা হইবে তাহা নহে, উহা কাহারও চাপে করা হইবে না। আমি যদি আফিসে যাইতে বিলম্ব করি, তবে আমার চাকরি যাইবে—এই বিশ্বাসে শীঘ্র যাওয়ায় কোন নীতি নাই। আবার আমার দৌলত নাই বলিয়া আমি সাদাসিধা গরিবের মত থাকি—ইহাতেও নীতি কিছু নাই। কিন্তু যদি আমি ধনবান হইয়াও এই প্রকার ভাবি যে, আমার চারিদিকে এত দারিদ্র্য, এত দুঃখ রহিয়াছে, এই সময় আমি আরাম আয়েস কি করিয়া ভোগ করিব, আমাকে গরিবের মতই সাদাসিধা ভাবে থাকিতে হইবে—তবে এই ভাবে যে সরল জীবন আসে তাহা নীতি-সম্মত বলা যায়। তেমনি চাকরেরা চলিয়া যাইবে আশঙ্কায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, অথবা তাহাদিগকে ভাল অথবা অধিক বেতন দেওয়া—ইহাতে নীতি কিছু নাই, ইহা স্বার্থ-বুদ্ধি মাত্র। আমি তাহাদের ভাল ইচ্ছা করি, আমার সমৃদ্ধিতে তাহাদেরও অংশ আছে, এই ভাবিয়া যদি তাহাদিগকে রাখা যায়, তবে তাহাতে নীতি থাকিতে পারে। অর্থাৎ নীতি-সম্মত কার্য জবরদস্তি বা ভয় ব্যতীতই হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের নিকট যখন কৃষকেরা চোখ রাঙ্গাইয়া কতকগুলি অধিকার চাহিতে আসে, তখন তিনি নিজে হাতেই তাহাদিগকে অধিকার-পত্র লিখিয়া দেন। যখন কৃষকদের ভয় আর তাঁহার রহিল না, তখন তাহাদের নিকট হইতে সেই পত্র ফেরত আদায় করিলেন।

এই দুই কার্য সম্বন্ধে যদি কেহ বলেন যে, প্রথম কার্যটা নীতি-সম্মত হইয়াছিল, আর দ্বিতীয়টা নীতি-বিগর্হিত হইয়াছিল, তবে সে কথা ভুল হইবে। রিচার্ডের প্রথম কার্য কেবল ভয় হইতেই করা হইয়াছিল, সেইজন্য উহার সহিত নীতির কোনও সংস্রব নাই।

নীতি-সম্মত কার্যে যেমন ভয় বা জোর থাকিবে না, তেমনি উহা স্বার্থ-স্পর্শ-শূন্য হইবে। ইহা বলার হেতু এ নয় যে, যে কার্যেই স্বার্থ আছে উহা

অকাজ, কিন্তু সে কার্য নীতি-সম্মত একথা বলায় নীতির দৃষ্টি ঘোরালো করিয়া দেওয়া হয়। কার্যোদ্ধারের উপায় বা পথ—এই প্রকার ধারণার উপর স্থাপিত বিশ্বস্ততা দীর্ঘ দিন টিকিতে পারে না। সেকস্পীয়র বলেন—"যাহা প্রীতিলাভ করার নজর হইতে করা হয় তাহাতে প্রীতি নাই।"

যেমন ইহলোকে লাভের ইচ্ছায় কৃত কার্যকে নীতি-সম্মত বলা যায় না, তেমনি পরলোকে সুখ হইবে এই আশায় কৃত কার্যকে নীতি-রহিত বলা হইয়া থাকে। ভালর জন্যই ভাল করাতে নীতি বিদ্যমান থাকে। মহামতি জেভিয়ার এমন ভক্ত ছিলেন যে, তাঁহার মন সর্বদাই স্বচ্ছ থাকিত। মৃত্যুর পর ভাল অবস্থা পাওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরে ভক্তি রাখিতেন না, কিন্তু ঐ প্রকার ভক্তি করাই মানুষের কর্তব্য জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ভক্তিমতী থেরিসা তাঁহার দক্ষিণ হাতে মশাল ও বাম হাতে জলের পাত্র রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। মশালের আগুনে স্বর্গ-সুখ জ্বালাইয়া দিয়া, জল দ্বারা নরকের আগুন নিভাইতে ইচ্ছা রাখিতেন, যেন মানুষ নরকের ভয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভক্ত হয়। এই ভাবে নীতি পালন করা মরণব্রতীদেরই কাজ। মিত্রদের সহিত সত্য ব্যবহার করা ও শত্রুকে দাগা দেওয়ার নাম ভীরুতা। যাহারা ভয়ে ভয়ে ভাল কাজ করে, তাহাদিগকে নীতি-হীনই বলিতে হইবে। হেনরী কেলবকের দয়া-মায়া ছিল বলা হয়। কিন্তু তিনি লোভের দেবতার কাছে নীতিকে বলি দিয়াছিলেন। ড্যানিয়েল ওয়েস্টর বাহাদুর লোক ছিলেন। তাঁহার বিচার-শক্তি উচ্চ ছিল, কিন্তু অর্থের জন্য তিনি একবার হীন হইয়া পড়েন। একটা নীচ কার্য দ্বারা নিজের অন্য সমস্ত কার্য ধুইয়া সাফ করেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে, লোকের নীতির পরীক্ষা করা কঠিন কার্য, কেননা নিজের মন সে পরীক্ষা করিতে পারে না। নীতি-সম্মত কার্যও তেমনি। যে প্রশ্ন এই অধ্যায়ের প্রথম করা হইয়াছিল, তাহার উত্তর দেওয়া হইল। কেমন লোক এই প্রকার নীতি পালন করিতে পারেন, তাহা আমরা অনায়াসে দেখিয়া লইয়াছি।

উত্তম নিয়ম কি

কোন কাজ ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে আমরা প্রায়ই অভিমত দিয়া থাকি। কতকগুলি কাজ হইতে আমাদের সন্তোষ হয়, আর কতকগুলি কাজে

আমাদের অসন্তোষ হয়। কোন একটা কাজ ভাল কি মন্দ, তাহার নির্ধারণ করিতে হইলে উহাতে আমাদের লাভ অথবা লোকসান হইবে, ইহা দেখিতে গেলে চলে না। উহা তুলনা করার রীতি অন্য প্রকার। আমাদের মনে কতকগুলি বিচার পছন্দ হয় এবং তাহার উপর আমরা অপরের কার্যের পরীক্ষা করিয়া থাকি। একজন লোক যদি অপরের ক্ষতি করে, তবে সে ক্ষতিতে আমাদের কিছু না আসিয়া গেলেও সে লোককে আমরা মন্দ বলি। কখন কখন যে ক্ষতি করে তাহার সহিত আমাদের সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলেও কাজটা যে খারাপ তাহা বলিতে আমাদের এতটুকুও ঠেকে না। এমনও হয় যে আমাদের উদ্দেশ্য কখন কখন খারাপ থাকে। লোকের কর্মের হেতু আমরা সকল সময় দেখিতে পাই না, সেইজন্য পরীক্ষাও অন্যায় হয়। তাহা হইলেও, কি উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কোন কোন অন্যায় কার্যদ্বারা আমাদের লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তবু কাজটা যে অন্যায় আমরা মনে মনে তাহা বুঝি।

ইহাতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, মন্দের আশ্রয়টা লোকের স্বার্থের উপর নহে। লোকের ইচ্ছার উপরও উহার নির্ধারণ অপেক্ষা করে না। ছেলেদের উপর টান আছে বলিয়া আমরা কোনও কোনও জিনিস তাহাদিগকে দিতে চাই। কিন্তু তাহাতে যদি হানি হয়, তবে উহা দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করি। টান রাখা অবশ্যই ভাল, কিন্তু নীতির বিচার করিয়া ঐ আকর্ষণের সীমা যদি না বাঁধিয়া ফেলি, তবে তাহা বিষের মত হইবে।

আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, নীতির নিয়ম অচল। মত বদলায় কিন্তু নীতি বদলায় না। আমরা চোখ খুলিলে সূর্য দেখিতে পারি, বন্ধ করিলে সূর্য দেখিতে পাই না। এইভাবে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। সূর্য যে নাই এমন ত নয়! নীতির নিয়ম সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অজ্ঞান অবস্থায় আমরা নীতি কি তাহা বুঝিতে পারি না। আর এই প্রকার ঘটাই সম্ভব। যখন আমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন বুঝিতে মুশকিল হয় না। লোকে সব সময় ভাল দিকে দৃষ্টি রাখে না, সেইজন্য অনেক সময়েই স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখিয়া অনীতিকে নীতি বলে। এমন একটা কাল অচিরে আসিবে, যখন লোকে স্বার্থের বিচার না করিয়া নীতি-বিচারের দিকে লক্ষ্য করিবে। নীতির স্থিতি এখনও বাল্যাবস্থায় রহিয়াছে। মানুষ, সত্য যে কি তাহা দেখিতে ব্যস্ত হয়। তখন নীতি-বিষয়ে অনুসন্ধান না

করিয়া পৃথিবী ইত্যাদির নিয়ম কি তাহারই সন্ধানে লাগিয়া যায়। এমন বিদ্বান কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে কষ্ট করিয়া লাগিয়া থাকিয়া প্রচলিত কুসংস্কার দূর করিয়া নীতি পালন করিতেই জীবন যাপন করিয়া থাকে। লোকে যেমন আজকাল প্রকৃতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত, তেমনি যখন নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইবে, তখন নীতি সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবে। প্রাকৃতিক শাস্ত্র সম্বন্ধে লোকের যত মতভেদ আছে, নীতি সম্বন্ধে তত মতভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলেও কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের নীতি-বিষয়ে একমত না হওয়াই সম্ভব। ইহার মানে এ নয় যে, ভাল মন্দের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের ইচ্ছা ও রীতি হইতে পৃথক কতকগুলি নীতির নিয়ম আছে। উহাদিগকে আমরা আইন বলিতে পারি। রাজ্যতন্ত্রে আইন কি তাহা আমরা জানি, নীতির আইনই বা থাকিবে না কেন? এই সকল আইন মানুষের তৈরি নহে, আর মানুষের তৈরি হওয়াও উচিত নহে। যদি নীতির আইন আমরা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে রাজ-কার্য-সংক্রান্ত আইনের বশে যেমন আমাদের থাকিতে হয়, তেমনি নীতির নিয়মের বশে থাকাও আমাদের কর্তব্য। নীতির আইন রাজ-কার্যের বা ব্যবসার আইন হইতে স্বতন্ত্র ও উত্তম।

নীতির নিয়ম ও সাংসারিক নিয়মের মধ্যে খুব পার্থক্য আছে। নীতির বাসস্থান আমাদের হৃদয়ের ভিতর। যখন লোকে নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখনও তাহা যে নীতি-বিরুদ্ধ তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। লুট করা কখনও ভাল কাজ নয়। যেখানে জন-সাধারণ নীতির নিয়ম পালন করে না, যেখানে লোক খুবই দুষ্ট প্রকৃতির, সেখানেও লোকে নীতি-পালন যে ভাল তাহা স্বীকার করিয়া থাকে, নীতির মহিমা এমনি। এই প্রকার নীতি, রীতি রেওয়াজ বা জন-মতের অপেক্ষা রাখে না। নীতিবান পুরুষ নীতি-সম্মত নিয়ম দ্বারাই বদ্ধ হন।

এমন নীতির আইন কোথা হইতে আসিল? ইহা ত কোনও রাজার তৈরি আইন নয়, কেননা ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন ভিন্ন আইন করেন ইহা দেখা যায়। সক্রেটিসের সময় যে নীতি তিনি পালন করিতেন, অনেক লোক সেই নীতির বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন, তবুও তখন তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই আজও রহিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও

থাকিবে। সারা জগৎ এই কথাই স্বীকার করিতেছে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি কখনও কোনও শয়তান পৃথিবীতে দ্বেষ ও মিথ্যার প্রবাহ চালায়, তাহা হইলেও ন্যায়, সততা ও সত্যরূপে ঈশ্বরই থাকিয়া যাইবেন। ইহা হইতে একথা বলা যায় যে, নীতির আইনের স্থান সর্বোপরি ও উহা ঐশ্বরিক।

এই প্রকার আইনের ভঙ্গ শেষ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা সমাজ করিয়া যাইতে পারে না। যেমন প্রবল ঘুর্ণিবায়ুও অবশেষে মিলাইয়া যায়, তেমনি অনীতি-পরায়ণ লোক নাশ পাইয়া থাকে। য়্যাসেরিয়া ও ব্যাবিলনে যখন দুর্নীতির ঘড়া পূর্ণ হয়, তখনই উহা ভাঙ্গিয়া যায়। রোম যখন দুর্নীতি গ্রহণ করে, তখন তাহার মহাপুরুষেরাও তাহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। গ্রীসের জন-সাধারণ কুশল হইলেও, তাহাদের কুশলতা দুর্নীতি টিকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ফ্রান্সের যে বিদ্রোহ হয় তাহা দুর্নীতি দূর করার জন্য। আমেরিকার ওয়েণ্ডল ফিলিপ্স বলেন যে, দুর্নীতি যদি রাজাসনেও বসে তবু সে টিকিতে পারে না। ইহাই নীতির রূপ। নীতির এই অপূর্ব নিয়ম যে ব্যক্তি পালন করে, সে উন্নত হয়। যে পরিবার পালন করে, তাহারা ঠিকমত চলিতে থাকে। যে সমাজে প্রতিপালিত হয়, সে সমাজ বিস্তার লাভ করে। যে জন-সাধারণ এই উত্তম নিয়ম পালন করে, তাহারা সুখ, স্বতন্ত্রতা ও শান্তি ভোগ করে।

নীতির সহিত ধর্মের সমাবেশ হয়

এই অধ্যায়ের বিষয় কিছু বিচিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণতঃ এই রকম ধরা হয় যে, নীতি ও ধর্ম আলাদা জিনিস, কিন্তু এই অধ্যায়ে নীতিকে ধর্ম বলিয়াই গণ্য করা হইতেছে। কোনও পাঠক মনে করিতে পারেন যে, গ্রন্থকার গোলমালে পড়িয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, নীতির মধ্যে ধর্ম সমাবিষ্ট নয়, আর যাঁহারা মনে করেন যে, নীতি হইলে আর ধর্মের আবশ্যকতা নাই, এই দুই পক্ষই ঐ প্রকার আরোপ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও, নীতির সহিত ধর্মের নিকটসম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাই গ্রন্থকারের স্থির সিদ্ধান্ত। নীতি-ধর্ম অথবা ধর্ম-নীতি-পালনকারী মণ্ডলী নীতি দ্বারাই ধর্ম পালন করিয়া থাকেন।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণভাবে দেখিতে গেলে নীতি ছাড়াও ধর্ম হইতে পারে। এমন অনেক দুরাচারী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ঘোর দুষ্কার্য করিয়াও নিজেদের ধার্মিক মনে করিয়া ফাঁকিতে পড়ে। আবার ইহার বিপরীত ফাঁকিতে স্বর্গগত ব্রাডলোর মত নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিও পড়িয়াছেন। ইহারা নিজেদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করে ও ধর্মের নাম সহ্য করিতে পারে না। এই উভয় নীতি অবলম্বনকারী লোকই ভুল করে, আর প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা কেবল ভুলই করে না, উপরন্তু ধর্মের নামে দুর্নীতির আচরণ করিয়া ভয়ংকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই এই অধ্যায়ে ইহাই দেখাইতেছি যে, বুদ্ধির সাহায্যে অথবা শাস্ত্রের অনুসারে দেখিলে দেখা যাইবে যে, নীতি ও ধর্ম একই এবং এক হওয়াই উচিত।

পূর্বে নীতি বলিতে কেবল সাংসারিক রীতি বুঝা যাইত, অর্থাৎ লোকে ভাল থাকিয়া কি ভাবে আচরণ করিবে, তাহা স্থির করাই নীতির কার্য মনে করিত। এই প্রকার করাতে ভাল যে সেই দাঁড়াইয়া যায় ও মন্দ নষ্ট পায়, কেননা যদিও মন্দ নীতির নাশ নাও হয়, যাহারা মন্দ রীতি অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা নষ্ট পায়। আমরা আজও দেখিতেছি যে, এই প্রকারই চলিতেছে। জানিয়া বা না জানিয়া লোকে যে ভাল রীতি অবলম্বন করিয়া থাকে, উহাকে নীতিও বলা যায় না, ধর্মও বলা যায় না। তাহা হইলেও দেখা যায়, যে সকল কার্য নীতি-সম্মত অধিকাংশ স্থলে তাহাই ভাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

লোকের ধর্মের সম্বন্ধে ধারণা অনেক সময়েই উপরে উপরে হইয়া থাকে। কখন কখন, আমাদের উপর যে সকল আঘাত আসে তাহা দূর করাই আমরা কতকটা ধর্ম বলিয়া মানি। কিন্তু এই প্রকার ভয় হইতে উৎপন্ন বিশ্বাসে যে সমস্ত কার্য করা হয়, সে সকলকে ধর্ম মনে করা ভুল।

এমন এক সময় আসে, যখন লোকে ইচ্ছাপূর্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া, লাভ হোক অথবা ক্ষতি হোক, বাঁচুক বা মরুক সংকল্প স্থির করিয়া, হোম করিয়া, বিলম্ব না করিয়া নীতির পথে চলে। তখন তাহাদের নীতির রং লাগিয়াছে বলা যায়।

এই প্রকার নীতি ধর্মকে আশ্রয় না করিলে চলিবে কি করিয়া? যদি অন্য লোকের সামান্য ক্ষতি করিয়াও আমি লাভ করিতে পারি, তবে সে

ক্ষতিটা কেন করিব না? অপরের ক্ষতি করিয়া যে লাভ হয় তাহা ক্ষতি— এ বিশ্বাস আমার কেন হইবে? যাহা বাহির হইতে দেখিতে লাভ বলিয়া মনে হয়, এমন কার্য করার জন্য বিসমার্ক জার্মাণীতে পাপের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে দেশের কি শিক্ষা হইল? সাধারণতঃ বালকদিগের যে নীতি-কথা শোনানো হইয়া থাকে, উহা কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল? সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি কেন নীতি-সম্মত আচরণ করিলেন না? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে, ঐ সকল ঘটনায় নীতি রক্ষা করা হয় নাই ও যে অন্যায় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, এই সকল স্থানে নীতির সহিত ধর্মের সমাবেশ ছিল না। যে পর্যন্ত নীতির বীজে ধর্মের জল সেচন না করা যায়, সে পর্যন্ত অঙ্কুর বাহির হয় না। জল বিনা বীজ শুষ্কই থাকিয়া যায়। আর দীর্ঘ দিন জল না পাইলে নষ্টও হইতে পারে। আমরা ইহা দেখিতেছি যে, সত্য নীতিতে সত্য ধর্মের সমাবেশ হওয়া চাই। এই বিচারই অন্য কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলা যায় যে, ধর্ম ব্যতীত নীতি রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ ধর্মরূপেই নীতি পালন করা চাই।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলিতে যে সকল নীতির নিয়ম বর্ণনা করা আছে, তাহা অনেকটা একই রকমের। ধর্মপ্রচারকেরা একথাও বুঝাইয়া থাকেন যে, ধর্মের আরম্ভ নীতির ভিত্তিতেই। যদি আমরা ভিত্তি খুঁড়িয়া ফেলি, তাহা হইলে ভিত্তির উপরকার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তেমনি যদি নীতিরূপ ভিত্তি না থাকে, তবে ধর্মরূপ গাঁথনিও মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়।

আমি একথাও বলিতেছি যে, নীতিই ধর্ম একথা বলায় দোষ নাই। ডাক্তার কোইট প্রার্থনাকালে বলিয়াছেন—"হে ঈশ্বর, নীতি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আমি চাই না।" ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিব যে, যদি মুখে মুখে ঈশ্বর বলি আর বগলে ছোরা লুকাইয়া রাখি, তবে ঈশ্বর আমাদিগকে কি দিবেন? কেহ ঈশ্বর আছেন একথা মানিয়াও তাঁহার সমস্ত আদেশ ভঙ্গ করে, আবার কেহ বা ঈশ্বর নাম দিয়া ঈশ্বরের পরিচয় লয় না, নিজের কার্যের ভিতরই তাঁহাকে পায় ও ঈশ্বরের নিয়মের ভিতরেই নিয়মের যে স্রষ্টা তাঁহার পরিচয় পায়। এই দুইজনের ভিতর কে যে নীতি-পরায়ণ ও ধর্ম-পরায়ণ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে মুহূর্ত মাত্র না ভাবিয়াই বলিয়া দেওয়া যায় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিই নীতি ও ধর্ম পরায়ণ।

জন্ম যে গেল প্রভুরে ডাকিয়া পেলাম না তবু তাঁরে,
বিপুল জগৎ খুঁজিয়া ফিরিনু, তাঁহারে মিলিল না রে।
হাজার নামের পঞ্জী রচেছি, জবাব পাইনি হায়,
যপ-তপ এত করিয়াছি—যার হিসাব করা না যায়।
সাধু সন্তের সঙ্গে ঘুরেছি, পড়েছি পুরাণ বেদ,
দেশ দেশ ঘুরি তবু দেখা নাই—একি দুঃসহ খেদ!
জন্ম আমার ব্যর্থ যে যায়, তবু তব দেখা নাই,
তুমিই আমারে ব'লে দাও প্রভু, তোমারে কেমনে পাই!
অন্তর্যামী হাসিয়া বলেন—কেমনে সফল হ'বি,
আমারে খোঁজার নাম ক'রে যদি স্বার্থে মজিয়া র'বি!
নামের ঝরণা ঝরিয়াছে মুখে—হৃদয়ে অহংকার,
ওরে ও দম্ভী, প্রভু তোর সে কি দম্ভের 'অবতার'!
ছলনার পাঠে হয়েছ নিপুণ—ঠকায়েছ বাপ মা'রে,
জগতে ছলিয়া অবশেষে হায় ছলেছিস আপনারে।
সহজ পথের পাল্টা চলিলে নিজেরি যে হয় হানি,
আনো অনুতাপ, শুভ বুদ্ধিতে ঘুচে যাবে সব গ্লানি!

বহেরামজী মলবারী

নীতি সম্বন্ধে ডারুইনের যুক্তি

প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ের বক্তব্য সম্বন্ধে বলার পূর্বে, ডারুইন কে ছিলেন তাহা জানা দরকার। তিনি গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র ছিল। তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করার ও ভাবার যোগ্য। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি নানা প্রকারের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক জাতীয় বানরই মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল। অনেক পরীক্ষা করিয়া ও অনেক অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, মানুষের ও বানরের আকৃতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ

নাই। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা, তাহার সহিত নীতির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ডারুইন তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে গিয়া লোকের উপর নীতির যে কি প্রভাব হয় তাহা জানাইয়াছেন। ডারুইনের লেখার উপর অনেক বিদ্বানের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, সেইজন্য লেখক ডারুইনের মত সম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিতেছেন।

ডারুইনের নীতি সম্বন্ধে মত

নিজের ইচ্ছায় যাহা করা যায় তাহার ভিতরেই ভব্যতা রহিয়াছে—একথা সত্য। লোকের ভব্যতার খাঁটী চিহ্ন হইতেছে এই যে, তাহারা বাদলের হাওয়ার মত দিক পরিবর্তন না করিয়া যে কাজ ভাল বোধ হয় সেই কাজ করার সংকল্প লইয়া অচল থাকে।

তাহা হইলেই আমাদের প্রবৃত্তির গতি কোন দিকে তাহা জানা যায়। আমাদের বাহ্য স্থিতি কতকগুলি আছে, তাহা অনুসরণ করিয়া চলা চাই। যেমন ধরুণ, হিমালয়ের মত যে স্থান ঠাণ্ডা, সেখানে ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, শরীর রক্ষার জন্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিমানের ন্যায় চলিতে হয়।

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আমাদের নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে, অথবা নীতি অনীতি কিছু আছে কিনা তাহা ধর্তব্যের মধ্যে না আনিয়াই চলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ডারুইনের অভিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ডারুইন যদিও নীতি বিষয়ের লেখক ছিলেন না, তথাপি বাহ্য বস্তুর সহিত নীতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রকার মনে করেন যে, লোকের নীতি অনীতির দিকে দেখার দরকার নাই। তাঁহারা ও যাঁহারা মনে করেন যে, দুনিয়াতে কেবল শারীরিক ও মানসিক বলই কাজ করিয়া থাকে, তাঁহারা ডারুইনের লেখা পড়িতে পারেন। ডারুইন বলেন যে, মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকার জন্য একটা আগ্রহ আছে। তিনি এ কথাও বলেন যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই বিজয়ী বলিয়া গণ্য

হইবে এবং যে অযোগ্য সে সমূলে নাশ হইবে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু শরীরের বল দ্বারাই চালানো যাইবে না।

মানুষের সঙ্গে ভালুক বা মহিষের তুলনা করা যাক। ইহা দেখা যাইবে যে, শরীরের বল দ্বারা মাপিলে ভালুক বা মহিষ মানুষের অপেক্ষা অধিক বলবান। উহাদের যে কোন একটার সহিত কুস্তি করিতে গেলে লোকে হারিয়া যাইবে, কিন্তু বুদ্ধিবলে মানুষ উহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কার্যের মধ্যেই আমরা ঐ প্রকার তফাৎ দেখিতে পারি। যুদ্ধের সময় যাহার কাছে অনেক যোদ্ধা থাকে তাহারই যে জয় হইবে তাহা ত নয়। কিন্তু যে পক্ষে কুশলতা ও ভাল নেতৃত্ব আছে, সে পক্ষ অল্প লোক লইয়া অথবা দুর্বল লোক লইয়াও জয়লাভ করিতে পারে। এই উদাহরণে আমরা বুদ্ধির বল দেখিতে পাই।

ডারুইন একথা বলেন যে, বুদ্ধি-বল ও শারীরিক বল অপেক্ষাও নীতি-বল শ্রেষ্ঠ। আর নীতি-পরায়ণ লোক অনীতি-পরায়ণ লোক অপেক্ষা অধিক দিন টিকিতে পারে। ইহা নানা রকমেই দেখা যাইতে পারে। কতক লোক মনে করে যে, ডারুইন ইহাই শিখাইয়াছেন যে, "জোর যার মুলুক তার" অর্থাৎ যাহার শারীরিক বল বেশি সেই শেষটায় জয়ী হয়। আর এই কথার উপর বিচার করিয়া লোকে একথা মানিয়া লয় যে, নীতির কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডারুইন মোটেই এ প্রকার বলেন নাই। আবার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হইতেও ইহাই দেখা যায় যে, যে সকল সম্প্রদায় নীতি-বিহীন তাহারা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। সোডম ও গমোরার লোকেরা বড়ই দুর্নীতি-পরায়ণ ছিল বলিয়া ঐ রাজ্যগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আজও আমরা দেখিতেছি যে, যে সকল সম্প্রদায় দুর্নীতি-পরায়ণ তাহারা নষ্ট পাইতেছে।

এক্ষণে আমরা কতকগুলি সাধারণ উদাহরণ লইয়া দেখিব যে, সাধারণ নীতি পালন করাও লোকের পক্ষে কত আবশ্যক। শান্ত-স্বভাব হওয়া নীতি-পরায়ণতার একটা অঙ্গ। উপরে উপরে দেখিলে সাধারণতঃ হয়ত ইহাই মনে হইবে যে, উদ্ধত লোক অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মেজাজরূপী তলোয়ার শেষকালটায় নিজের ঘাড়েই আসিয়া পড়ে। ব্যসনে আসক্ত হইতে নাই ইহা নীতির আর একটা নিয়ম। বেশ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা ত্রিশ বৎসর

বয়সে মদ্যপানাসক্ত হয়, তাহারা আর তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বাঁচে না। আর যাহারা ব্যসন-আসক্ত নয় তাহারা ৭০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ব্যভিচার না করা নীতির তৃতীয় নিয়ম। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, ব্যভিচারী খুব দ্রুত মারা গিয়া থাকে। তাহাদের সন্তান হয় না, আর যদি হয় তবে খুব দুর্বল হয়। ব্যভিচারী লোকের মন হীন হইয়া যায়, আর যতই দিন যায় এবং বয়স বাড়ে, ততই নির্বোধের মত হয়, দেখা যায়।

আমরা যদি সম্প্রদায়ের নীতি লইয়া আলোচনা করি তাহা হইলেও ইহাই দেখা যাইবে। আন্দামানের লোকেরা উহাদের স্ত্রীর কোলের ছেলে একটু বড় হইলেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের পরমার্থ বুদ্ধির পরিবর্তে অত্যন্ত স্বার্থ বুদ্ধিই দেখা যায়। ফলে এই হইয়াছে যে, সেখানকার লোক ধীরে ধীরে ধ্বংস পাইতেছে। ডারুইন বলেন, পশুদের ভিতরেও কতকটা পরমার্থ বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ ভীরু পাখীরাও নিজেদের সন্তান রক্ষা করার বেলায় সাহসী হইয়া পড়ে, ইহাতেই একথা বুঝা যায় যে, প্রাণীমাত্রের মধ্যেই পরমার্থ বুদ্ধি যদি কতকটা পরিমাণ না থাকিত, তাহা হইলে সংসারে কাঠ, খড় ও বিষবৃক্ষ ছাড়া আর কোনও জীব থাকিত না। মানুষ ও অন্য প্রাণীর ভিতর মুখ্য তফাৎ এই যে, মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরমার্থী। অপরের জন্য, অর্থাৎ নিজের নীতিবুদ্ধি অনুযায়ী নিজের সন্তানের জন্য, দেশের জন্য মানুষ নিজের জীবন সমর্পণ করিয়া থাকে।

ডারুইন একথা সাফ করিয়া বলিয়াছেন যে, নীতি-বল সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। গ্রীস দেশের লোক এখনকার ইউরোপবাসী লোক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ছিল। যখন তাহারা নীতিমার্গ ত্যাগ করে, তখন তাহাদের বুদ্ধিই তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, আর আজ তাহাদের কেহই নাই। পয়সার জোরে, সৈন্যের জোরে লোকে টিকিয়া থাকিতে পারে না, একমাত্র নীতির উপরই টিকিতে পারে। এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া পরমার্থরূপী পরম নীতির আচরণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

কখন কখন একথা বলা হয় যে, নীতির ভিতরেই সার্বজনীন কল্যাণ রহিয়া গিয়াছে। এ কথা ঠিক। যে বিচারকের ন্যায়-বুদ্ধি আছে, তাহার আদালতে ন্যায়ের জন্য গেলে লোকে সুখ পাইবে। প্রীতি, মমতা ও উদারতা ইত্যাদি গুণও অন্যের সঙ্গেই প্রয়োগ করা যায়। প্রভুভক্তির শক্তিও একের

সহিত অপরের সম্পর্কের সহিত যুক্ত। স্বদেশাভিমানীর সম্বন্ধে আর বলার কি আছে? সত্য দেখিতে গেলে এ কথা বুঝা যাইবে যে, এমন কোনও নীতি নাই যাহার ফল নীতি-পালনকারী না পায়। কখন কখন এ কথা বলা হইয়া থাকে যে, সত্যতা ইত্যাদি গুণের সহিত লোকের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও ঠকাইলে তাহার ক্ষতি হয় একথা যদি মানি, তাহা হইলে সত্য বলায় বিরুদ্ধ পক্ষ ক্ষতি হইতে রক্ষা পায় একথা ত স্বীকার করিতেই হইবে।

তেমনি আবার যখন কোনও নিয়ম অথবা রীতি অপছন্দ করিয়া কেহ উহা পরিত্যাগ করে, তখন জন-সমাজের উপর তাহার প্রভাব হয়। এই ধরণের লোক কল্পনা-রাজ্যে বাস করে। এই কাল্পনিক জগৎ এখনো সৃষ্ট হয় নাই। এই প্রকার লোকের জন্য, প্রচলিত যে রীতি ভাল নয়, সেই রীতির অনাদর করাই যথেষ্ট। এই প্রকারে নিজের মনের মত পথে অপরকে আনার জন্য তাহারা সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে। এইভাবেই মহাপুরুষেরা পৃথিবীর চক্রগতির পরিবর্তন করিয়া থাকেন।

যে পর্যন্ত লোকে স্বার্থী থাকিবে, যে পর্যন্ত লোকে অপরের সুখের দিকে দৃষ্টি না দিবে, ততদিন তাহারা ত পশুর মত অথবা তাহা হইতেও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিবে। মানুষকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তখনই আমরা দেখিয়া থাকি, যখন সে নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি যখন নিজের দেশকে অথবা নিজের সম্প্রদায়কে সেই পরিবার ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। যখন সারা মনুষ্য জাতিকেই সে কুটুম্ব মধ্যে গণ্য করে, তখন সে পূর্বাপেক্ষাও উর্ধ্বে উঠিয়া থাকে। আর মানুষ যে পরিমাণে এই ধারণা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না, সেই পরিমাণে সে হীন অথবা অপূর্ণ। আমার সম্প্রদায়ের অথবা আমার স্ত্রীর জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু অপর লোকের জন্য কোনও আকর্ষণ যদি না থাকে, তবে বুঝিব যে, আমার কাছে মনুষ্য জাতির দুঃখের কোনও মূল্য নাই—স্ত্রী পুত্র বা সম্প্রদায় যাহাদিগকে আমার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, তাহাদের জন্য কেবল বুদ্ধি বা স্বার্থ-বুদ্ধি হেতুই-কতকটা আকর্ষণ আছে মাত্র।

এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে দয়া-ভাব উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নীতি-ধর্ম কি তাহা জানা যায় না, তাহা পালন করা যায় না। ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, উচ্চাঙ্গের নীতি সার্বজনীন হওয়া চাই।

আমাদের উপর প্রত্যেক লোকেরই এই প্রকার দাবি রহিয়া গিয়াছে যে, সর্বদা তাহাদের সেবা করাই আমাদের কর্তব্য, আর আমাদের কাহারও উপর দাবি নাই এই প্রকার ব্যবহার করা চাই। কেহ একথা হয়ত বলিবেন যে, এই প্রকারের লোক পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ পদদলিত হইবে। কিন্তু এই ধরণের কথা কেবল অজ্ঞানীরাই বলিতে পারে, কেননা এই প্রকার একনিষ্ঠার সহিত সেবা-পরায়ণ লোককে ঈশ্বর বাঁচাইয়া থাকেন, ইহাই পৃথিবীব্যাপী অনুভূতি।

এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত লোকই এক প্রকার। উহার অর্থ কেহ যেন এমন না করেন যে, সকল লোকেরই সীমা এক প্রকার, অথবা সকলেই এক রকমের কার্য করে। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের সীমা আমরা বাড়াইয়া ফেলি এবং সেই সীমার ভিতরস্থ দায়িত্ব পালন করার শক্তি আমাদের আছে। উহাতে অহংকৃত হওয়ার অথবা যাহারা আমার অপেক্ষা কম দায়িত্ব লয় তাহারা কোনও রকমে ছোট, এরূপ মনে করার কিছুই নাই। একত্ব ভাবটা আমাদের মনের উপর প্রতিষ্ঠিত—যে পর্যন্ত আমাদের মনের অবস্থা এই প্রকার না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা পিছনেই পড়িয়া থাকিব।

এই নিয়ম অনুসারে কোন এক জাতীয় লোক নিজের স্বার্থের জন্য অপর জাতীয় লোকের উপর রাজত্ব করিতে পারে না। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে তুচ্ছ করিয়া ইউরোপের লোকেরা যে রাজত্ব করে তাহা নীতি-গর্হিত। যদি সুসভ্য প্রজা অল্প সভ্য প্রজার সংস্পর্শে আসে, তবে অল্প সভ্যদিগকে নিজের মত করিয়া তোলাই তাহাদের কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে রাজা প্রজার উপরে নয়, বরঞ্চ ভৃত্য মাত্র। আমলারা চাকরি ভোগ করার জন্য রহে নাই, প্রজাকে সুখী করার জন্যই রহিয়াছে। প্রজাতন্ত্র রাজ্যে যদি লোকে স্বার্থী হয়, তবে সে রাজ্য কোনও কাজের নয়।

এক রাজ্যের অধিবাসী অথবা এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সবলেরই দুর্বলকে রক্ষা করিতে হয়। সে যদি তাহা না করে তবে লোকের কষ্ট হইবেই। এই প্রকার ব্যবস্থার ভিতর কেহ অনাহারেও থাকে না, আবার অত্যন্ত ধনীও হইতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশীদিগকে দুঃখী দেখিয়া আমাদের ত সুখে থাকা চলে না, আর পরম নীতি যাহারা পালন করে তাহাদের অর্থ সঞ্চয় করাও চলে না। এই প্রকারের নীতি পৃথিবীতে প্রতিপালিত হইতে অল্পই দেখা যায় বলিয়া নীতিপরায়ণদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কেননা লোকে নীতি অনুযায়ী আচরণই করিতে পারে, ফলাফল

বা পরিণাম ত হাতে নাই। নীতি অনুযায়ী আচরণ না করিলে দোষ হয়, কিন্তু সে নীতির পরিণাম জনসাধারণের উপর যদি না হয় তবে তাহাতে দোষের কিছুই নাই।

সমর্পণ

"সে আমি জানি", "উহা আমার কর্তব্য" ইত্যাদি যুক্তি মানুষকে টলাইয়া ফেলে এবং আশ্চর্য করে। একটা গোপন শব্দ কানে কানে এই কথাই বলিতে থাকে যে, "ওরে মানুষ একাজ তোমার, তোমাকে নিজেই ইহা করিতে হইবে, তোমাকেই হার অথবা জয়লাভ করিতে হইবে। তুমিই তোমার প্রকৃতির মত। প্রকৃতি দুইটা জিনিস এক রকম করিয়া তৈরি করে না। তোমার যাহা করা কর্তব্য তাহা যদি না কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে সব দিক দিয়াই তাহা দোষের হইবে।"

আমার এই প্রকার করার অধিকার কি আছে? কেহ বলেন—"আদমকে খোদা বলিও না, আদম খোদা নহে, কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আদম ভিন্নও নহে।" এই প্রকার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ হয়ত ধরিয়া লইবে যে, সে নিজেই খোদার প্রভা। আবার কেহ বা বলিবে যে, আমাকে আমার আশপাশের লোকের প্রতি প্রীতি দেখাইতে হইবে, ভ্রাতৃভাব রাখিতে হইবে। তৃতীয় আর কেহ বলিবে, মা-বাপের সেবা করিবে, ছেলেপিলেকে দেখাশুনা করিবে, ভাই-বোন ও মিত্রের প্রতি ঠিক ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে আমাকে আমার নিজের প্রতিও ত সেই ঠিক ব্যবহারই করিতে হইবে, ইহাও ত আমার কর্তব্য! যতদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে না চিনিতে পারিতেছি, ততদিন কি করিয়া অপরকে মান দিব? অনেকে এ রকমও মনে করে যে, লোকের অপরের সম্পর্কেই ন্যায় অনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা অপরের সম্পর্কে না আসিতেছি ততদিন নিজেদের ইচ্ছামত যেমন খুশি তেমনই ব্যবহার করিতে পারি। যে এ প্রকার মনে করে সে বুঝে নাই। পৃথিবীতে থাকিয়া হানি না করিয়া কেহ নিজের মতে নিজে চলিতে পারে না।

আমাদের নিজের প্রতি নিজের কি কর্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ ত নিজের প্রতি ব্যবহারের খবর আমরা নিজেরাই

রাখি আর কেহ রাখে না। এই ব্যবহারের প্রভাব নিজের উপর হয়, কাজেই উহার জন্য আমরাই দায়ী, এই মনে করাই যথেষ্ট নয়, এই কার্য দ্বারা অপরের উপর যে প্রভাব হয় তাহার জন্যও আমরাই দায়ী। প্রত্যেকেরই নিজের উত্তেজনা সংযত করিতে হইবে। একজন মহাপুরুষ বলেন যে, যে কোনও লোক নিজের চালচলন আমাকে জানাইলে, সে ব্যক্তি কেমন তাহা আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিব। এই কারণেই আমাদের ইচ্ছাকে সংযত রাখিতে হয়। মদ খাইতে নাই, অতি আহার করিতে নাই, যদি করি তবে শক্তিহীন হইয়া সম্মান খোয়াইব। যে ব্যক্তি বিষয়-আসক্তি ত্যাগ করিয়া শরীর মন বুদ্ধি ও প্রাণের দিকে তাকায় না, সে ব্যক্তির বাহ্যিক কাজ ভাল লাগিবে না।

এই ভাবনা হইতে, নিজের অন্তর-বৃত্তি সাফ রাখিয়া কিভাবে উহা ব্যবহার করা যায় এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। জীবনে কোনও নিশ্চয় ধারণা লইয়া চলা চাই। জীবনের কর্তব্য স্থির করিয়া সেই দিকে যদি ঝুঁকিয়া না থাকা যায়, তবে কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় আমরা বিপথে ডুবিয়া যাইব। সর্বাপেক্ষা উচ্চ কর্তব্য হইতেছে জন-সেবা করা ও লোকের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। ইহাই সত্য ঈশ্বর-স্তুতি, সত্য বন্দনা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাজ করে সে ঈশ্বরী পুরুষ। অনেক প্রবঞ্চক ও ধূর্ত ঈশ্বরের নাম লইয়া কাজ করিয়া থাকে। তোতা পাখী যখন ঈশ্বরের নাম লয়, তখন তাহার ভিতর ঈশ্বর-চিন্তা কিছু আসে না। অবস্থানুযায়ী নিয়ম পালন সকলেই করিতে পারে। উকিলও সেই ঈশ্বর সেবার ধারণা লইয়া ওকালতি করিতে পারে। ব্যাপারী এই ধারণা লইয়া ব্যবসা করিতে পারে, আর এই নিয়ম পালন করিলে নীতি-ধর্ম হইতে স্খলন হয় না। ঐ ভাবে চলিতে গেলে মানবের আর্থিক উন্নতি করার ধারণা হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

বিশেষ ভাবে বিচার করা যাক। আমাদের সর্বদাই খোঁজ রাখিতে হইবে যে, আমাদের জীবন-যাত্রা ভাল কি মন্দের দিকে চলিয়াছে। যে ব্যবসায়ী, সে ব্যবসা করার সময় প্রত্যেক বেচাকেনাতেই বিচার করিবে যে, সে অপরকে ঠকাইতেছে কিনা। উকিল বা ডাক্তারও মক্কেল ও রোগীর সম্বন্ধে এই ভাবে খুব চিন্তা করিবে। ছেলেপিলে মানুষ করিতে গিয়া সর্বদা ভয় রাখিতে হইবে যে, নিজের মিথ্যা ভালবাসার জন্য অথবা নিজের

স্বার্থপর স্বভাবের জন্য উহাদিগকে যেন বিগড়াইয়া না দেওয়া হয়। মজুর মজুরি করিতে গিয়াও নিজের এই কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মোটকথা এই যে, মজুর যদি মজুরি করিতে গিয়া নীতি-সম্মত ভাবে কার্য করে, তাহা হইলে সে স্বার্থপর ব্যাপারী ডাক্তার বা উকিল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। মজুর ত খাঁটি টাকার মত, আর অধিকতর বুদ্ধিমান, ধনবান, স্বার্থী উকিল বা ডাক্তার মেকী টাকার মত। নীতির নিয়ম পালন যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও অবস্থায় থাকিয়া করিতে পারে—ইহাই উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যায়। লোকের মূল্য তাহার জীবন-যাত্রার ধরণের উপর নির্ভর করে, কি কাজ করিতেছে তাহার উপর নয়। এই জীবন-যাত্রার ধরণ কাহারও বাহিক কর্মদ্বারা পরীক্ষা করা যায় না, তাহার হৃদয়-বৃত্তি দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। কেহ গরিবকে কাছ হইতে দূর করার জন্য যদি একটা টাকা ফেলিয়া দেয়, আর একজন যদি দয়াপরবশ হইয়া একটা আনি দেয়, তবে যে আনি দিয়াছে সে নীতি-পরায়ণ, যে টাকাটা দিয়াছে সে পাপী।

এই সকল কথার সার এই দাঁড়াইতেছে যে, যে ব্যক্তি নিজে শুদ্ধ, দ্বেষ করে না, কাহারও উপর অন্যায় সুবিধা করিয়া লয় না, সর্বদা মন পবিত্র রাখিয়া ব্যবহার করে, সেই ধার্মিক সেই ধনবান। তাহার দ্বারাই মনুষ্য জাতির সেবা হইতে পারে। যদি দিয়াশলাইয়ের কাঠিতেই আগুন না থাকে, তবে অন্য কাঠ জালাইব কি দিয়া? যে ব্যক্তি নিজে নীতি পালন করে না, সে অপরকে কি শিখাইবে? নিজে যে ডুবিয়া যাইতেছে সে কাহাকে উদ্ধার করিবে? নীতি পালন করিতে গেলে পৃথিবীর সেবা কম করা যায় এ প্রকার প্রশ্ন তুলিবার দরকার নাই। কেননা এ প্রশ্ন আসে না। ম্যাথু আরনল্ড বলেন যে—"এক সময় আমি আমার বন্ধুদের জন্য স্বাস্থ্য জয় ও কীর্তি ইচ্ছা করিতাম। এখন আর সে প্রকার ইচ্ছা করি না। উহা হোক বা না হোক, উহার উপর আমার বন্ধুর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না। সেইজন্য এখন ইচ্ছা করি যে, তাঁহাদের নীতি যেন সর্বদা অবিচল থাকে।" ইমার্সন বলিয়াছেন যে—"ভাল লোকের দুঃখও তাহার সুখই বটে, আর মন্দ লোকের অর্থ ও কীর্তি তাহার এবং দুনিয়ার দুঃখের কারণ।"

সর্বহিত

প্রস্তাবনা

পশ্চিম দেশে সাধারণতঃ এই প্রকার ধারণা আছে যে, অধিক লোকের সুখ বা অভ্যুদয় বাড়ানোই মানুষের কাজ। সুখ বলিতে শারীরিক সুখ, টাকা পয়সার সুখ, এই অর্থ করা হয়। যদি এই সুখ পাইতে নীতির নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়, তবে তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। অধিক লোকের সুখের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার এই হেতু যে, যদি অল্প লোককে দুঃখ দিয়া অধিক লোককে সুখ দেওয়া যায়, তবে তাহা করিতে ক্ষতি নাই। ইহাই পশ্চিমের লোকেরা মনে করিয়া থাকেন। ইহার পরিণাম যে কি, তাহা আমরা পশ্চিম দেশের সকল স্থানেই দেখিতেছি।

বেশি লোকের শারীরিক ও আর্থিক সুখ যাহাতে হয় সেই প্রচেষ্টা করা ঈশ্বরের নিয়ম নহে। আর যদি সেই চেষ্টা করায় নীতির নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহা ঈশ্বরের নিয়ম-বিরোধী কার্য হয়—এই কথাই পশ্চিমের কতিপয় জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় জন রাস্কিন একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব বিদ্বান ইংরেজ ছিলেন। চিত্রকলা ও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহার লেখা অনেকগুলি ভাল পুস্তক আছে। নীতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে ছোট একখানা পুস্তক হইতেছে, "আনটু দিস লাস্ট"। তিনি নিজেই বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে এইখানাই সর্বাপেক্ষা ভাল। যে যে স্থানে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানেই ইহা খুব পঠিত হয়। অধিক লোকের হিত করার মতবাদ এই বহিতে খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, একমাত্র নীতির নিয়ম পালনেই জনসাধারণের কল্যাণ হয়।

আজকাল হিন্দুস্থানে আমরা পশ্চিম দেশের খুব নকল করিয়া থাকি। কতক পরিমাণে উহা করা আবশ্যক বলিয়াই আমরা মানি। কিন্তু পশ্চিম

দেশের অনেক রীতি যে খারাপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা খারাপ তাহা দূর করার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা অত্যন্ত করুণা-জনক। আমরা পয়সা উপার্জন করিবার জন্য বিদেশে যাই, আর সেই গোলমালে নীতি কি, ঈশ্বর কে তাহা ভুলিয়া যাই, স্বার্থের মধ্যে মিশিয়া যাই, ডুবিয়া যাই। ফলে, বিদেশে যাওয়ায় লাভ না হইয়া বরঞ্চ অনেক ক্ষতি হয়, অথবা বিদেশে যাওয়ার জন্য যে লাভ হওয়ার কথা তাহা পুরাপুরি হয় না। সকল ধর্মের সঙ্গেই নীতি যুক্ত রহিয়াছে। ধর্মের বিচার না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধি মত নীতি পালন করা আবশ্যক ও ইহাতেই সুখ—এই কথা জন রাস্কিন বলেন। তিনি পশ্চিম দেশের লোকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং আজ তাঁহার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া অনেক ইউরোপীয় জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার যুক্তি ভারতীয়দের পক্ষেও খাটে বলিয়া উল্লিখিত পুস্তক হইতে, যাহারা ইংরেজী জানে না তাহারাও বুঝিতে পারে এইভাবে, কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছি।

মানুষের কি করা উচিত তাহা কিছু কিছু সক্রেটিস দেখাইয়াছেন। একথা বলা যায় যে, রাস্কিনের এই লেখাগুলি সক্রেটিসের কথারই বিস্তার। যাঁহারা সক্রেটিসের বিচার অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিভিন্ন কর্ম ব্যবসায় কি ভাবে ব্যবহার করিবেন, তাহাই রাস্কিন ভাল রকমে দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার লেখার যে সারাংশ দিতেছি, ইহাকে তর্জমা বলা চলে না। অনুবাদ করিতে গেলে, বাইবেল ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি উদাহরণ পাঠকের বুঝিতে না পারার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আমি রাস্কিনের লেখার সারাংশ দিতেছি। পুস্তকখানার নামেরও অনুবাদ করি নাই, কেননা ঐ বইয়ের নাম যিনি বাইবেল পড়িয়াছেন শুধু তিনিই বুঝিবেন। পুস্তকখানা লেখার অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে সকলেরই—অধিকাংশের নয় সকলেরই—কল্যাণ হয়। সেইহেতু ইহার নাম সর্বোদয় (সর্বহিত) বা সকলের হিত ইহাই দিয়াছি।

সভ্যতার মূল

মানুষ অনেক ভুল করিয়া ফেলে। মানুষের পক্ষে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির কথা বিচার না করিয়া, সত্যের হিসাব রাখার দরকার নাই মনে করিয়া, ব্যবহারিক নিয়ম সৃষ্টি করার অপেক্ষা বড় ভুল কিছু নাই। এই প্রকার ভুল করা আমাদের পক্ষে দোষের। উপরে উপরে দেখিলে অন্য ভুলের মধ্যে যেমন সত্যের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, লৌকিক নিয়ম সম্বন্ধেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা লৌকিক নিয়ম সৃষ্টি করেন তাঁহারা বলেন যে, "পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি একটা আকস্মিক বস্তু এবং এই সহানুভূতি সাধারণ প্রাকৃতিক রীতির বিরুদ্ধ, বরঞ্চ লোভ ও উন্নতি করার ইচ্ছাই সর্বদা সাথের সাথী। সেইজন্য যাহা আকস্মিক তাহা ত্যাগ করিয়া, অর্থ উপার্জন করাকেই সত্য গণ্য করিয়া, কি প্রকারে শ্রম করিলে বা কোন কারবার করিলে বেশি পয়সা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, লোকের তাহাই চিন্তা করা উচিত। এই প্রকার ভাবনার উপর রীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তারপর একে অন্যের প্রতি যতটুকু সহানুভূতি বজায় রাখা যায় তাহা রাখিয়া লৌকিক ব্যাপার চালাইতে হয়।" যদি পারস্পরিক সহানুভূতি একটা লেনদেনের মত জিনিস হইত, তাহা হইলে উপরের যুক্তি ঠিক বলা যাইত। কিন্তু মানুষের প্রীতি বা সহানুভূতির সম্পর্ক একটা অন্তরের পদার্থ, আর লেনদেনের রীতি একটা সাংসারিক নিয়ম মাত্র। সেইজন্য এই দুইটি বস্তু এক জাতীয় নহে। কোন একটা জিনিসের গতি যদি এক দিকেই থাকে, আর তাহার উপর একটা শক্তি সর্বদার জন্য ক্রিয়া করে ও আর একটা শক্তি মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে আমরা প্রথমতঃ সর্বদা ক্রিয়াশীল শক্তি মাপ করিয়া পরে আকস্মিক শক্তির মাপ করিয়া থাকি। এই উভয় শক্তির যোগ বা বিয়োগের ফল হইতে সে দ্রব্যের গতি স্থির করিতে পারা যায়। এই প্রকার যে করা যায় তাহার হেতু হইতেছে এই যে, ঐ দুই প্রকারের শক্তি —সর্বদা প্রযুক্ত ও আকস্মিক শক্তি, একই জাতীয়। কিন্তু মানুষের ব্যবহারের ভিতর, লেনদেনের সর্বদা ক্রিয়াশীল শক্তি ও পারস্পরিক স্নেহ ও সহানুভূতির আকস্মিক শক্তি এই যে দুইটা শক্তি কার্য করিতেছে, ইহারা দুই জাতীয়। স্নেহ প্রীতি মানুষের উপর ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন নিয়মে কাজ করিয়া থাকে। উহা মানুষের স্বরূপ বদলাইয়া দেয়। সেইজন্য কোন বস্তু বিশেষের উপর

দুই শক্তির ক্রিয়ার ফল যেমন যোগ বিয়োগ করিয়া আমরা হিসাব করিয়া বাহির করিতে পারি, তেমন করিয়া স্নেহ প্রেমের শক্তির হিসাব বাহির করিতে পারি না। লোকের উপর স্নেহ প্রীতির প্রভাব হিসাব করার বেলায় লেনদেনের ব্যবহারিক নিয়ম কোনই কাজে আসে না।

লৌকিক শাস্ত্রের ধারাই ভুল একথা বলার কোনও হেতু নাই। যদি ব্যায়াম শিক্ষক ইহাই স্থির করিয়া লয় যে, মানুষ কেবল মাংসপিণ্ডমাত্র, হাড়-পাঁজর নাই এবং এই ভিত্তির উপর যদি সে নিয়ম সৃষ্টি করে, তবে সে ভুল নিয়ম হইবে, সে নিয়ম হাড়-পাঁজর-যুক্ত মানুষের পক্ষে খাটিবে না। সেইজন্যই লৌকিক শাস্ত্রের নিয়ম সত্য হইলেও, যেখানে মানুষেরা সহানুভূতি ও প্রীতিতে বদ্ধ সেখানে সে নিয়ম খাটে না। কসরতগীর একথা বলিতে পারে যে, মানুষের মাংসগুলি আলাদা করিয়া উহা দ্বারা পিণ্ড পাকাও বা লম্বা করিয়া টানিয়া উহাকে দড়ির মত কর। আর তাহার পর যদি একথাও বলা হয় যে, উহাতে হাড়-পাঁজরাও লাগাইয়া দাও, তাহা হইলে কি মুশকিলে পড়িতে হইবে! এই রকম কেহ বলিলে আমরা তাহাকে পাগল বলিয়া থাকি, কেননা হাড়-পাঁজরা আলাদা করিয়া, মাংস আলাদা করিয়া কসরতের নিয়ম খাটানো যায় না। ঠিক সেই প্রকার, সাংসারিক শাস্ত্রের নিয়ম যদি মনুষ্য জাতির অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিয়াই খাটানো হয়, তবে তাহা কোন কাজে আসে না। কিন্তু তাহা হইলেও আজকালকার সাংসারিক ব্যবস্থার নির্ধারণকারী শাস্ত্রীরা উপরোক্ত কসরতবাজের মতই করিতেছেন। তাঁহাদের হিসাবে, মানুষের শরীরটাই যে সত্য ইহাই ধরিয়া লইয়া তাঁহারা নিয়ম তৈরি করেন। শরীরের ভিতর যে জীব আছে, তাহা তাঁহারা জানিয়াও গণনার মধ্যে আনেন না। যে মানুষের ভিতর জীব বা আত্মাই প্রধান—মুখ্য, সে মানুষের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটে কেমন করিয়া?

অর্থশাস্ত্র ত শাস্ত্রই নয়। উহা যে কোনও কাজের নয়, তাহা এক এক বার ধর্মঘট হইলেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সে সময় মালিক একপ্রকার যুক্তি করে, মজুর আর একপ্রকার যুক্তি করে। কোন একটা লেনদেনের নিয়ম তখন কাজে লাগানো যায় না। মাথা কুটিয়া লোকে বুঝাইতে চায় যে, মজুর ও মালিকের স্বার্থ একই, কিন্তু দুইয়ের ভিতর কেহই তাহা বুঝিতে চায় না। বাস্তবিক যদি দুইজনের স্বার্থ একই হয়, তাহা হইলে একের অপরের বিরোধী হওয়ার আবশ্যক করে না। ধরুন এক ঘরে খাদ্যাভাব

হইয়াছে। বাড়িতে মা ও ছেলে আছে, এখন এই দুই জনের, মা'র এবং ছেলের খাওয়ার স্বার্থ ত বিরোধী। মা যদি খায় তবে ছেলে ক্ষুধার্ত থাকে, আর ছেলে খায় ত মা ক্ষুধার্ত থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মা ও ছেলের ত কোনও ভেদ থাকে না! মায়ের গায় জোর বেশি বলিয়া মা-ই সমস্তটা ভাত ত খাইয়া ফেলে না! মানুষের পরস্পরের মধ্যে এই প্রকারের স্বার্থের সম্বন্ধই বুঝিতে হইবে।

ধরিয়া লওয়া যাক যে, মানুষ ও পশুতে কোনও ভেদ নাই। আমাদেরও পশুরই মত স্বার্থের জন্য পরস্পরের সহিত লড়িতে হইবে। তাহা হইলেও আমরা নিয়ম বাঁধিয়া বলিতে পারি না, মালিক মজুরের মধ্যে সর্বদা ভেদ থাকিবে কিনা। অবস্থানুসারে সেই ভাবের পরিবর্তন করিতে হয়। ধরুন না কেন কোনও একটা কাজের কথা। কাজটা ভাল হওয়া চাই, যেন দাম পুরা পাওয়া যায়—ইহাতে ত উভয়েরই স্বার্থ রহিয়াছে। কিন্তু যখন লাভের অংশ বিতরণের সময় হয়, তখন একের লাভে অপরের লোকসান হইতে পারে। মজুর রুগ্ন ও অকর্মা হইয়া পড়ে এমন কম বেতন দেওয়ায় মালিকের স্বার্থ নাই, আবার যেখানে কারবার ঠিক চলিতে পারে না সেখানে মজুরের বেশি বেতন চাওয়ায় তাহার স্বার্থ নাই। যদি মালিকের হাতে কারবার ঠিক রাখার মত অর্থ না থাকে, তবে মজুরের পক্ষে তাঁহার নিকট হইতে পুরা বেতন বা সমস্ত বেতন চাওয়া ভাল দেখায় না।

ইহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল লেনদেনের নীতির উপর কোনও শাস্ত্র খাড়া করিলে তাহা কাজে খাটানো চলে না। ইহা ঈশ্বরেরই নিয়ম যে, টাকা পয়সার কম-বেশির হিসাবের উপর মানুষের ব্যবহার স্থাপিত করিতে নাই। ব্যবহারের ভিত্তি ন্যায়ের উপর। সেইজন্যই লোকের পক্ষে নীতি হোক অনীতি হোক, যে প্রকারে কাজ চালাইতে পারা যায় সেই প্রকারে কাজ চালাইয়া লওয়ার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করিতে হয়। কোনও এক রীতিতে কাজ করিলে ভবিষ্যতে কি হইবে, একথা সব সময় বলা যায় না। কিন্তু এই কাজটা ন্যায্য, আর এই কাজটা অন্যায়, ইহা ত আমরা অনেক সময়েই জানিতে পারি। আর আমরা কেবলমাত্র এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, নীতি-মার্গে চলিলে পরিণাম ভালই হইতে হইবে। সেই পরিণাম কি যে হইবে আর কিভাবে তাহা ফলিবে, একথা আমরা বলিতে পারি না।

নীতি অথবা ন্যায়ের মধ্যেই পরস্পরের অনুভূতির সমাবেশ রহিয়াছে। আর সেই অনুভূতির উপরই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের ভিত্তি রহিয়াছে। প্রভু যতটা পারে ভৃত্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে ইচ্ছা করে। সে ভৃত্যকে এতটুকুও কাজের ফাঁক দেয় না, কম বেতন দেয়, বাড়িতে ভাণ্ডারীর মত করিয়া রাখে। সংক্ষেপতঃ, দেহে যাহাতে প্রাণ রাখিতে পারে, ততটুকু মাত্র প্রভু ভৃত্যকে দিয়া থাকেন। এই ব্যবহার করায় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহাতে অন্যায় কিছু নাই। ভৃত্য নির্দিষ্ট বেতন লইয়া তাহার সমস্ত সময় মনিবকে দেয় এবং মনিব তাহা গ্রহণ করেন। কতটা কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে, মনিব তাহা অপরকে দেখিয়া স্থির করিয়া দেন। যদি ভৃত্য বা মজুর বেশি বেতন আর কোথাও পায়, তবে তাহা লওয়ার জন্য ঐ কাজ ছাড়িয়া দৌড়ায়। আর লেনদেনের অর্থশাস্ত্রও ইহাই করিতে বলে। সেই শাস্ত্র একথাও বলে যে, এমনি করিয়া যত কম পয়সা দিয়া যত বেশি কাজ পাওয়া যায় তাহাতেই মনিবের লাভ ও অন্তিমে তাহাতে ভৃত্য বা মজুরেরও লাভ আছে।

বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, কথাটা ঠিক নয়। যদি মজুর একটা যন্ত্রমাত্র হইত ও সেই যন্ত্র চালাইবার জন্য বিশেষ প্রকারের শক্তি লাগাইতে হইত, তাহা হইলে এই হিসাব খাটিত। কিন্তু এখানে মজুরকে যে চালায় সে শক্তি ত তাহার আত্মার। আর আত্মার যে বল, তাহা অর্থশাস্ত্রের সকল নিয়মের বাহিরে ও উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত ও সকল নিয়মকেই তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। মানুষরূপ কলে পয়সারূপ কয়লা দিলেই বেশি করিয়া কাজ আদায় করা যায় না। যেখানে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেইখানেই মজুর ভাল কাজ দিতে পারে। মনিব ও মজুরে সম্পর্ক পয়সার না হইয়া প্রীতির হওয়া চাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেখানে মনিব বুদ্ধিমান ও উৎসাহী সেখানে চাপ পড়িলেই মজুর নিজের কাজ করিয়া যায়। আবার ইহাও হয় যে, যেখানে মনিব অলস ও দুর্বল সেখানে মজুর যতটা উচিত ততটা কাজ করে না। কিন্তু সত্যিকার নিয়ম ত এই যে, যদি দুইজন মনিবের বুদ্ধি সমান থাকে ও দুইজনের মজুরও একই রকম হয়, তাহা হইলে যে মনিব সহানুভূতি-পরায়ণ তাহার মজুর সহানুভূতিহীন মনিবের মজুর অপেক্ষা অধিক ও ভাল কাজ দিবে।

কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম ঠিক না। দয়া-মায়ার ব্যবহার করিলে তাহার পরিবর্তে অনেক সময়ই বিপরীত ব্যবহার পাওয়া যায়। মজুর মাথায় ওঠে। কিন্তু এই প্রকার যুক্তি সত্য নহে। যে মজুর সদয় ব্যবহার পাইয়া দায়িত্বহীন ব্যবহার করে, তাহার উপর চাপ দিলে সে কৃতঘ্নতা করিবে। যে মজুর উদারহৃদয় মনিবের প্রতি অবিশ্বস্তভাবে ব্যবহার করে, সে মজুর অন্যায়কারী মনিবের ক্ষতিই করিবে।

এই হেতু সকল সময় প্রত্যেক মানুষের প্রতি পরোপকারের দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে ভাল ফলই হয়। এখানে অনুভূতিকে আমরা এক প্রকার শক্তি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লই। মমতা যে একটা ভাল জিনিস, আর সর্বদাই যে উহার আশ্রয়ই লওয়া উচিত তাহা ঠিক কথা, কিন্তু এখানে সে আলোচনা করিতেছি না। এখানে কেবল ইহাই দেখাইতেছি যে, অর্থশাস্ত্রের যে সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে মায়া স্নেহ বা অনুভূতির শক্তিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিতেছে।

অনুভূতি ভিন্ন প্রকারের শক্তি বলিয়া অর্থশাস্ত্রের দেওয়া নেওয়ার স্বার্থের নিয়মগুলির সহিত মিল খায় না। উহা অর্থশাস্ত্রের নিয়ম এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াই নিজ পথে চলিতে থাকে। যে মনিব অঙ্ক পাতিয়া হিসাব করিয়া প্রতিদান পাওয়ার আশাতেই মায়া দেখায়, তাহার নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মায়া ত মায়ার জন্যই করা হয়, উহার প্রতিদান না চাহিতে আপনি আসে। একটা কথা আছে নিজেকে পাইতে হইলে নিজেকে মরিতে হয়, নিজেকে রাখার চেষ্টাতেই নিজেকে খোয়ানো হয়।

পল্টন ও তাহার সর্দারের উদাহরণ দেখুন। যদি কোনও সর্দার অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নিজের পল্টনের সিপাহীর নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে চায়, তবে সে নির্দিষ্ট কাজই গুছাইয়া লইতে পারে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, যে পল্টনের সর্দার নিজেই সিপাহীদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের সহিত স্নেহময় ব্যবহার করে, তাহাদের আনন্দে আনন্দ পায়, দুঃখে দুঃখ বোধ করে, সংক্ষেপে বলিলে তাহাদের প্রতি অনুভূতি-পরায়ণ হয়, নিজে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই সর্দারই সিপাহীদের নিকট হইতে যত কঠিন কাজ হোক না কেন, আদায় করিয়া লইতে পারে। ঐতিহাসিক উদাহরণ হইতেও দেখা যাইবে যে, যেখানে সিপাহীরা সর্দারকে দেখিতে পারে না সেখানে যুদ্ধে জয় বড় হয় না। সিপাহী ও সর্দারের মধ্যে এই যে প্রীতির শক্তি বর্তমান আছে,

ইহা একটা সত্যকার শক্তি। তেমনি লুণ্ঠনকারী দলের মধ্যেও সর্দারের সহিত দলের প্রীতির বন্ধন রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি আমরা মিল ইত্যাদি কারখানায় মনিব বা মজুরের মধ্যে এই প্রকার গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। ইহার একটা কারণ এই যে, এই ধরণের কারখানায় মনিব ও মজুরের মধ্যে কেবল লেনদেনের সম্পর্কই আছে। সেইজন্যই মনিব-মজুরে প্রেমের সম্পর্ক না থাকিয়া তাহার বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। আকর্ষণের পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে বিরোধই দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু দুইটা প্রশ্নের বিচার করিতে হয়।

এক হইতেছে এই যে, লেনদেনের হিসাব না করিলে মজুরদিগের বেতন কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা যায়। দ্বিতীয় হইতেছে এই যে, যেমন পুরাতন পরিবারের ভিতর চাকরের স্থান, সেখানে যেমন চাকরে মনিবে সম্বন্ধ, অথবা যেমন পল্টনের ভিতর সিপাহী সর্দারের সম্বন্ধ, তেমনি সম্বন্ধ কারখানায় মনিবের সহিত মজুরদের হইতে পারে কিনা। মজুরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া, সময় যেরূপ হোক না কেন, সংখ্যার কমবেশি না করিয়া কেমন করিয়া চালানো যায়।

প্রথম প্রশ্নের বিচার করা যাক। আশ্চর্য এই যে, অর্থশাস্ত্রীরা কারখানার মজুরদের কাজের জন্য বেতনের একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু তবুও ত আমরা দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ নীলাম করিয়া বিক্রয় করা হয় না। যেমন লোকই হোন না কেন, তাঁহাদের সকলকেই এ পদে একই বেতন দেওয়া হয়। তেমনি যে সবচাইতে কম বেতন লইবে তাহাকেই আমরা পাদ্রী করি না। ডাক্তার উকিলদের বেলাতেও বেতনের সম্পর্ক রাখি না। ইহাতেই দেখা যায় যে, যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়ার প্রথা আমরা সর্বত্র ব্যবহার করি না। উহা ব্যবহার করার একটা সীমা আছে। কেহ বলিতে পারেন যে, তবে কি ভাল ও মন্দ মজুরের একই রকম বেতন হইবে? বাস্তবিক ত তাহাই হওয়া উচিত। তাহাতে ফল এই হইবে যে, আমরা যেমন সকল ডাক্তারের ফী একরকম হইলেও ভাল ডাক্তারকেই ডাকিয়া থাকি, যে সকল উকিলের ফী একই রকম তাহার মধ্যে ভাল উকিলকেই নিযুক্ত করিয়া থাকি, তেমনি সকল মজুরের মজুরি এক হইলেও আমরা ভাল মজুর বা কারিগরকেই কাজে লাগাইব। ভাল মজুরের বা কারিগরের পুরস্কার এই যে, লোকে তাহাকে

পছন্দ করিয়া থাকে। এমনি করিয়াই বেতনের একটা স্বাভাবিক ও সত্যকার সীমা টানা হইয়া যাওয়া উচিত। যেখানে আনাড়ী লোক অল্প বেতন লইয়া মনিবকে ঠকায়, সেখানে ফল খারাপই হয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বিবেচনা করা যাক। ব্যবসার অবস্থা যাহাই হোক না কেন, কারখানায় যত কারিগর রাখা হয় তাহাদিগকে স্থায়ীভাবেই রাখা উচিত। যেখানে মজুরের কার্যের স্থায়িত্ব নাই সেখানে তাহাদিগকে বেশি বেতন চাহিতেই হয়। মজুরেরা যেখানে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, তাহার চাকরি আজীবন বজায় থাকিবে, সেখানে সে খুব কমেতেই কাজ করে। মনিব যদি মজুরকে স্থায়ী ভাবে রাখে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ভালই হয় দেখা যাইতেছে। যে কারখানায় এই প্রকার স্থায়ী ভাবে লোক রাখা হয়, সেখানে বেশি লাভ হইতে পারে না। সেখানে বড় রকম ঝক্কিও লওয়া যায় না, আর টাকার কাঁড়িও একত্র করা যায় না। সৈনিক তাহার সর্দারের জন্য মরিতে প্রস্তুত, সেইজন্য সৈনিকের কাজ অন্য কাজ অপেক্ষা বেশি সম্মানের। সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে সৈনিকের কাজ মানুষকে হত্যা করা নয়, বরঞ্চ অপরকে রক্ষার জন্য নিজেই মৃত্যু বরণ করা। যে সৈনিক হইয়াছে, সে নিজের প্রাণ নিজের দেশের জন্য সমর্পণ করিয়াছে। উকিল ডাক্তার বা পাদরীর সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। সেইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। উকিলকে প্রাণ দিয়াই ন্যায়-পরায়ণ হইতে হয়। বৈদ্যকে অনেক কষ্ট করিয়াই রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। আর অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তবুও পাদরীর তাঁহার যজমানকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য, তাহার কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য কাজ করিয়া যাইতে হয়।

যদি উপরোক্ত জীবিকাগুলির সম্বন্ধে এই কথা খাটে, তবে ব্যবসা বাণিজ্যেও তাহা খাটিবে না কেন? ব্যবসাক্ষেত্রে প্রায়ই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ব্যবসাকে স্বার্থের কাজ বলিয়াই গণ্য করিয়া লওয়া হয়। ব্যবসার কাজ যদিও জন-সমাজের জন্যই আবশ্যক, তথাপি উহাকে কেবল নিজের উদর পূর্তির কাজ বলিয়াই ধরা হয়। ব্যবসাদারেরা যাহাতে চট করিয়া বড়লোক হইয়া উঠিতে পারে, আইন কানুন তাহারই অনুকূল। প্রচলিত রীতিই এমনি হইয়া উঠিয়াছে যে, ক্রেতা যতটা পারে কম দাম দিবে ও বিক্রেতা যতটা পারে বেশি আদায় করিবে। আর

ইহাতেই লোকে ব্যবসাদারের বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে নীচু ধারণা পোষণ করে। এই রীতির পরিবর্তন করা দরকার। ব্যবসাদারেরা যে কেবল স্বার্থ সিদ্ধিই করিবে, টাকা পয়সাই সঞ্চয় করিবে, এমন ত কথা নয়! এই রকম করাকে ব্যবসা করা না বলিয়া চুরি বলা যায়। সৈনিক যেমন দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তেমনি ব্যবসাদারকেও প্রজার হিতের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়, নিজেকেও পর্যন্ত বলি দিতে হয়। প্রত্যেক রাজ্যেই—

প্রজার পালন হবে সৈনিকের ব্রত,
পাদরী করিবে তারে শিক্ষায় নিরত।
উকিলের ব্রত হ'বে তারে ন্যায় দান,
বৈদ্যের কর্তব্য তার স্বাস্থ্যের বিধান।
তারেই করিতে দান, নিজের ভাণ্ডারে
সঞ্চয় করিবে বৈশ্য পণ্যের সম্ভারে।

এই সব জীবিকা আশ্রয়কারী ব্যক্তিদেরই আবশ্যক হইলে নিজের জীবন সমর্পণ করাও উচিত।

সৈনিকের নিজের স্থান ত্যাগ করার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করা উচিত। মড়কের সময় পলাইয়া না গিয়া, নিজের সে রোগ হওয়ার ভয় থাকিলেও রোগীর চিকিৎসা করা বৈদ্যের কর্তব্য।

সত্যকার শিক্ষা দিতে গেলে লোকে যদি মারিয়াও ফেলে, তবুও পাদরীকে অসত্যের পরিবর্তে সত্য-শিক্ষাই প্রচার করিতে হয়।

ন্যায়ের জন্য যদি মরিতেও হয়, তথাপি ন্যায় প্রাপ্তিরই চেষ্টা করিবে, ইহাই উকিলের কর্তব্য।

কিন্তু উল্লিখিত জীবিকা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ওরূপ করিয়া মরার আবশ্যক কি, এই প্রশ্নের বিচার ব্যাপারীর ও অন্য সকল উপজীবিকার লোকেরই করা দরকার। যে ব্যক্তি আবশ্যক উপস্থিত হইলে মরিতে জানে না, সে জীবন কি তাহাও জানে না। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যাপারীর কাজ প্রজার আবশ্যকীয় মাল যোগানো। যেমন পাদরীর ব্যবসা বেতন ভোগ করার জন্য নয়, লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তেমনি ব্যাপারীর কার্যও লোকের মাল যোগানো, পয়সা রোজগার করা নয়। যে পাদরী লোক-শিক্ষা দেন, তিনি উদরান্ন পাইয়া থাকেন, তেমনি ব্যাপারীও লাভ পাইয়া থাকেন। এই দুই জীবিকার একটাও বেতন পাওয়ার বা

লাভ করার দৃষ্টিতে করিতে নাই। উভয়েরই, বেতন পান বা না পান, লাভ হোক বা না হোক, তথাপি নিজ নিজ জীবিকা অনুসরণ করাই বিধি। যদি এই যুক্তি ঠিক হয়, তবে ব্যবসায়ীর কার্যও উত্তম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তখন সে প্রজার জন্য উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করিতে ও প্রজা কিনিতে পারে এইভাবে তাহাকে যোগাইতে থাকে। এই কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া তাহার অধীনে শত শত বা হাজার হাজার লোক খাটিলে তাহাদের রক্ষা করা কর্তব্য, তাহাদের সুব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহা দেখা কর্তব্য। এই প্রকার ব্যাপার করিতে অনেক ধৈর্য, অনেক স্নেহ-মমতা ও অনেক কুশলতা চাই এবং এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য করিতে গিয়া তাহাকেও যদি অপর জীবিকাশ্রয়ীদের মত মরিতে হয়, তবে মরা চাই। এই প্রকার ব্যবসায়ীর উপর যতই সংকট আসুক না কেন, সে যদি ভিখারীও হইয়া যায়, তবুও মাল খারাপ করে না ও লোককে প্রবঞ্চিত করে না। উপরন্তু সে নিজের অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত মমতার সহিত ব্যবহার করে। অনেক সময় যুবকেরা কারখানায় অথবা ব্যবসাক্ষেত্রে চাকরি করিতে গিয়া বাড়ি-ঘর হইতে দূরে থাকে। সেখানে ত মনিবকেই মা-বাপ হইতে হয়। আর যদি ব্যবসায়ী উদাসীন হয়, তবে সেখানে যুবকেরা বাপ-মা হারা হইয়া পড়ে। এইজন্যই ত পদে পদে ব্যবসায়ী অথবা মনিবের নিজকে মনে মনে একই প্রশ্ন করিতে হয়, সে প্রশ্ন এই—

"আমি আমার নিজের ছেলেদিগের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি, আমার অধীনস্থ মজুর বা ভৃত্যদিগের প্রতি কি সেই প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকি?"

কোনও কাপ্তানের অধীনে যখন খালাসীরা কার্য গ্রহণ করে, তখন সে খালাসীরা কাপ্তানের সন্তানই হইয়া পড়ে। কাপ্তানের কর্তব্য সকল লশকরকেই সন্তানের ন্যায় গণ্য করা। তেমনি কোনও ব্যাপারীর ব্যবসার ভিতর অনেক চাকর বা মজুরের মধ্যে নিজের ছেলেও যদি একজন থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজের ছেলের প্রতি যে ব্যবহার করেন, ভৃত্যদের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। ইহাকেই বলে সত্যকার অর্থশাস্ত্র। সেই প্রকার জাহাজ যখন বিপদে পড়ে তখন কাপ্তানের কর্তব্য যেমন সকলের শেষে সে বিপদগ্রস্থ জাহাজ ত্যাগ করা, তেমনি যখন আকাল পড়ে অথবা অন্য কোনও সংকট ব্যবসার উপর পড়ে, তখন নিজের লোকদিগকে রক্ষা করাও

ব্যাপারীর প্রাথমিক কর্তব্য। এই প্রকার যুক্তি কাহারও নিকট আশ্চর্য ঠেকিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার লাগাই হইতেছে এই কালের নতুনত্ব। যদি সত্য সত্যই বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে আমি যে প্রকার বলিলাম উহাই রীতি হওয়া উচিত। যে প্রজাকে উর্ধ্বে উঠিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে অন্য প্রকারের কোনও রীতি চলিতেই পারে না। ইংরেজ প্রজাদের যে আজ পর্যন্তও চলিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা অর্থশাস্ত্রের বা লেনদেনের নিয়ম পালন করে। বরঞ্চ তাহারা অনেক সময়ই অর্থশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া উপরোক্ত নিয়মই পালন করিয়া থাকে। আর সেইজন্যই এখানকার লোকদের এক্ষণে দিন চলিতেছে। এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য প্রজার কি প্রকার ক্ষতি হয়, কেমন পিছাইয়া পড়িতে হয়, তাহা পরে বলিব।

আমরা সত্যের মূল কি সে সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি। তাহার জবাব অর্থশাস্ত্রীরা কেহ কেহ নিম্ন মত দিয়া থাকেন। "পরস্পরের সহানুভূতি দ্বারা কতক লাভ হয় একথা ঠিক। কিন্তু এ জাতীয় লাভের হিসাব লেনদেনের অর্থশাস্ত্রীরা করেন না। তাঁহারা যে শাস্ত্রের নিয়ম পালন করেন তাহাতে যে কোনও প্রকারে হোক অর্থ উপার্জন করার যুক্তিই পালন করিয়া থাকেন। আর এই শাস্ত্রটা যে মিথ্যা নয়, বরঞ্চ স্বার্থের সহায়কই বটে তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যদি তাহারা ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী চলে, তবে তাহারা খুব অর্থশালী হইয়া থাকে। ইউরোপের অনেক ধনাঢ্য লোক এই শাস্ত্র অনুযায়ী চলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধ-যুক্তি করা কিছু নয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞ লোকই জানেন যে, অর্থ কেমন করিয়া আসে আর কেমন করিয়া যায়।

এই সব কিন্তু ঠিক কথা নয়। ব্যবসায়ীরা অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু তাহা সদুপায়ে উপার্জন করিয়াছে কিনা ও তাহাতে সম্প্রদায়ের হিত হইল কিনা একথা তাহারা জানিতে পারে না। ধনবান শব্দের অর্থ তাহারা অনেক সময়েই বুঝিতে পারে না। যেখানে ধনী আছে সেইখানেই দরিদ্র আছে—একথা তাহারা বুঝিতেই পারে না। অনেক সময় লোকে ভুল করিয়া বলিয়া থাকে যে, একটা বিশেষ পথে চলিলে সকলেই ধনী হইতে পারে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই ধনবান হওয়ার ব্যাপারটা জল তোলার চাক্কীর মত। একটা যদি খালি হয় তবে অপরটা

ভরে। তোমার কাছে যদি একটা টাকা থাকে, তবে তাহার অস্তিত্বের প্রভাব যাহার কাছে টাকা নাই তাহার উপর পড়ে। যদি অপর লোকের ঐ টাকার গরজ না থাকে, তবে তোমার টাকা অকেজো হইয়া যায়। তোমার টাকার অস্তিত্বের প্রভাব তোমার প্রতিবেশীর নির্ধনতার উপর নির্ভর করে। যেখানে নির্ধন আছে সেইখানেই ধনীরা চলিয়া যায়। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি কেহ ধনবান হয় তবে অপরে দরিদ্র থাকে।

সার্বজনিক অর্থশাস্ত্রের মানে এই যে, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত কালে আনন্দদায়ক বস্তু উৎপাদন করা, উহা রক্ষা করা ও বিতরণ করা। যে কৃষক সময় মত শস্য উৎপাদন করে, যে রাজ ভাল করিয়া গাঁথনির কাজ করে, যে ছুতার কাঠের কাজ ভাল করিয়া করে, যে স্ত্রী নিজের রান্নাঘর ভাল রাখে, সে সম্পূর্ণরূপে সত্য সত্য অর্থশাস্ত্রী। সে সকল প্রজার ধন বৃদ্ধি করে। ইহার বিপরীত যে শাস্ত্র তাহাকে সার্বজনীন বলা যায় না। উহাতে একজন মাত্র টাকা জমায়, আর সে অপরকে অভাবের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া সে টাকার ব্যবহার করে। এই প্রকারে যাহারা অর্থের ব্যবহার করে তাহারা নিজের ক্ষেত খামার ও পশ্বাদি হইতে কত টাকা হইতে পারে সেই হিসাব করিয়া নিজেদিগকে ধনবান মনে করে। তাহাদের টাকার পরিবর্তে যতটা জমি বা পশু পাইতে পারে তাহাই যে টাকার মূল্য, সে কথা ভাবে না ও তাহারা টাকা ও সোণা রূপা সংগ্রহ করিতে থাকে। ঐ অর্থে তাহারা কত মজুর খাটাইতে পারে সে কথা ভাবে।

এক্ষণে ধরিয়া লওয়া যাক যে, কোনও ব্যক্তির নিকট সোণা রূপা ও শস্যাদি আছে। এরকম লোকের মজুরের আবশ্যক। কিন্তু যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও সোণা রূপা বা শস্যের আবশ্যক না থাকে, তবে তাহার মজুর পাওয়া শক্ত হইবে। অর্থাৎ উক্ত ধনবান ব্যক্তিকে রান্না নিজেই করিয়া লইতে হইবে, নিজের সেলাইয়ের কাজ নিজে করিতে হইবে, নিজের ক্ষেত নিজে চষিতে হইবে। এই ব্যক্তির নিকট তাহার সোণার দাম খোলার কুচির সমান। তাহার সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য পচিবে, কেননা তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা সে ত বেশি খাইতে পারে না! অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তিকে অপরের ন্যায় কঠিন পরিশ্রম করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে। আর যদি এই অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে অনেক লোকে আর সোণা রূপা ইত্যাদি জমাইতে চাহিবে না। যদি গভীরভাবে বিচার করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, টাকা জমানো মানেই

অপরের উপর অধিকার লাভ করা, নিজের সুখের জন্য চাকর ব্যবসায়ী ও কারিগরকে খাটাইয়া লওয়া। এই প্রকার খাটাইয়া লওয়া কতটা সম্ভব তাহা নির্ভর করে যাহাদিগকে খাটানো হইবে তাহাদের দারিদ্র্যের উপর। একজন ছুতারকে মজুরি খাটাইবার মত একজন মাত্র লোকই যদি থাকে, তবে সে ছুতারকে সেই ব্যক্তি যে মজুরি দেয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ছুতার খাটাইবার দুই চারজন লোক থাকে, তবে যে বেশি পয়সা দিবে সেইখানেই ছুতার কাজ করিবে। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, অর্থশালী হওয়া মানে অপরকে যথাসম্ভব নিজের অপেক্ষা দরিদ্র করিয়া রাখা। সাংসারিক অর্থশাস্ত্রীরা একথা বলিয়া থাকে যে, এইভাবে প্রজাকে দরিদ্র করিয়া রাখাতেই প্রজার লাভ। কিন্তু সকল লোকই যে সমান থাকিবে ইহা হইয়া উঠিতে পারে না। বরঞ্চ অন্যায় করিয়া লোকের মধ্যে দারিদ্র্য উৎপাদন করাতে প্রজা দুঃখীই হয়। স্বাভাবিক ভাবে ধনী দরিদ্র থাকায় প্রজা সুখী হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

ধনের নেশা

কোনও প্রজা-সমাজের ভিতর অর্থের চলাচল, শরীরে রক্ত-চলাচলের সহিত তুলনা করা যায়। যদি দেহে রক্ত জোরে জোরে চলে তবে তাহা স্বাস্থ্যের ও ব্যায়ামের চিহ্ন অথবা লজ্জা কিম্বা জ্বরের চিহ্ন বলিয়া ধরা যায়। সুস্থ শরীর হইলে দেহে এক প্রকার রক্তিম আভা দেখা দেয়। অন্য এক প্রকারের রক্তাভা রক্তপিত্ত রোগ সূচিত করে। আবার কোনও এক স্থানে যদি রক্ত জমাট হইয়া থাকে তবে তাহাতে যেমন শরীরের ক্ষতি হয়, এক জায়গায় তেমনি যদি অর্থ জমাট থাকে তবে তাহাও প্রজার ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে।

ধরুন দুইজন জাহাজের খালাসী জাহাজ ডুবি হওয়ায় কোনও জনশূন্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সেইখানেই তাহাদিগকে নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের দিনপাত করিতে হয়। যদি দুইজনেই সুস্থ থাকিয়া কাজ করে, তবে দুইজনেই বেশ ঘর বাঁধিয়া, ক্ষেত-খামার করিয়া কিছু ভবিষ্যতের জন্য বাঁচাইতেও পারে। উহাকে সত্যকার ধন বলিতে পারি। আর যদি দুইজনেই ভালভাবে কার্য করে, তবে দুইজনের অংশেই সম-পরিমাণ হয়।

অর্থাৎ তাহাদের উপর যে অর্থশাস্ত্র প্রযুক্ত হয় তাহাতে এই বলিবে যে, দুইজনে পরিশ্রমের ফল ভাগ করিয়া লইতে পারিবে। এক্ষণে মনে করুন, কিছুদিন পরে একজনের একত্র কাজ করিতে অনিচ্ছা হইল। তাহারা নিজ নিজ জমি ভাগ করিয়া লইল ও প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করিতে লাগিল। তারপর মনে করুন একজন অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন অপর ব্যক্তিকে সে সাহায্য করার জন্য ডাকিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতে পারে যে, আমি তোমার জন্য কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু সর্ত এই যে, যখন আবশ্যক হইবে তখন তোমাকেও আমার জন্য খাটিয়া দিতে হইবে। তোমাকে লিখিয়া দিতে হইবে যে, যত ঘণ্টা আমি তোমার জন্য খাটিব, তত ঘণ্টা তোমাকে আমার জমিতে খাটিতে হইবে। তারপর ধরুন সেই রোগীর অসুস্থতা দীর্ঘদিন চলিল, আর প্রতিবারেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ প্রকার লিখিয়া দিয়া কাজ লইতে হইল। এই অবস্থায় রোগী ও সুস্থ ব্যক্তির পরস্পর স্থিতি কি? দুইজনেই গরিব হইয়া গেল বলিতে হইবে। যখন রোগী শয্যায় পড়িয়াছিল, তখন তাহার কার্যের জন্য কিছু লাভ হইতেছিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি খুব কার্যক্ষম একথা ধরিয়া লইলেও, সে রোগীর জমিতে যত সময় কাজ করিয়াছে নিজের জমিতে সেই সময়টা দিতে পারে নাই—একথা ত সোজা। সেইজন্য দুইজনের যে সম্পত্তি হইতে পারিত তাহার কম হইল।

কিন্তু পরিবর্তন আরও অধিক হওয়ার পর উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বদলাইয়া গেল। রোগীটি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ঋণগ্রস্ত হইল। এখন সে নিজের মজুরি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়াই নিজের অন্নাদি পাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাক যে, এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই স্বীকার-পত্রগুলি ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিল। যদি সে তাহা করে তবে তখন সে নিজে আয়েস করিতে পারে, অলস হইতে পারে, অথবা যদি ইচ্ছা করে তবে প্রথমোক্ত লোকের নিকট হইতে আর একবার সর্ত লিখাইয়া লইতে পারে। আর তাহা যে অন্যায় হইবে একথাও কেহ বলিতে পারে না। এখন যদি কোনও বিদেশী সেখানে আসিয়া পড়ে, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, একজন লোক ধনশালী হইয়াছে ও অপর জন পীড়িত হইতেছে। একজন আয়েস আরাম করিয়া অলস হইয়া পড়িয়াছে, অপর জন মজুরি করিয়াও দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে। ইহা হইতেই পাঠক দেখিবেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মজুরি করার ফলে এই হইয়াছে যে, সত্য সম্পত্তি কমিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় উদাহরণ লওয়া যাক। তিন জন লোক মিলিয়া এক রাজ্য স্থাপনা করিল ও বসবাস করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল, যাহা সকলেরই কাজে লাগিতে পারে। মনে করুন যে, তাহাদের মধ্যে একজন সকলের সময় বাঁচাইবার জন্য নিজের চাষ পরিত্যাগ করিয়া একের মাল অন্যকে পঁহুছাইয়া দেওয়ার কাজ লইল ও তাহার পরিবর্তে তাহাদের অন্নাদির অংশ লওয়া স্থির করিল। যদি এই ব্যক্তি নিয়মানুযায়ী মাল আদান প্রদান করিতে থাকে তবে সকল প্রজার লাভ হয়। এখন ধরিয়া লউন মাল বিক্রয় করার সময় এই ব্যক্তি চুরি করিল। তাহার পর যখন দুঃসময় আসিল, তখন সেই দালাল নিজের চোরাই মাল খুব বেশি দামে বিক্রয় করে। এই প্রকারে পরিণামে সে দুইজন কৃষককেই ভিখারী করিয়া ফেলে এবং অবশেষে তাহাদিগকে নিজের মজুর করিয়া লয়।

উপরের উদাহরণে অন্যায়টা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও এই অবস্থাতেই আজকালকার ব্যবসায়ীরা চলিতেছে। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, এই চুরির ঘটনাটা ঘটার পরে যদি তিন জনের সম্পত্তি একত্র করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, যদি ঐ দালাল বিশ্বস্ত হইত তাহা হইলে একত্রিত সম্পত্তি যতটা হইত তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে। ঐ দুইজন চাষার কাজও কম হইয়াছিল। তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি না পাওয়াতে তাহাদের পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইতে পারে নাই। আবার সেই চোর দালালের হাতে যে মাল আসিয়াছিল সে তাহার সম্পূর্ণ ও সৎ ব্যবহার করিতে পারে নাই। এইভাবে আমরা গণিতের হিসাব করিয়া দেখিতে পারি যে, কোনও ব্যক্তি বিশেষের ধন কিভাবে উপার্জিত হইয়াছে তাহারই উপর, সে ধনবান কিনা তাহা নির্ভর করে। প্রজার নিকট এতটা অর্থ আছে বলিয়াই তাহাদিগকে অর্থশালী বলা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের হাতের টাকা যেমন তাহার অধ্যবসায় চাতুর্য ও উদ্যমশীলতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তেমনি উহা অনিষ্টকারী ভোগবিলাস, অত্যাচার ও জাল জুয়াচুরির চিহ্ন বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। আর এই প্রকার হিসাব করিতেই শুদ্ধ নীতিশাস্ত্র বলে। এক প্রকার ধন আছে যাহা দশগুণ ধনের সমান, আবার আর এক প্রকারের আছে যাহাতে দশগুণ হানির কারণ হয়।

এই হেতু, নীতি দুর্নীতির বিচার না করিয়া ধন সংগ্রহ করার রীতি ও নিয়ম স্থির করাতে মানুষের অহংকারই প্রকট হয়। "যত পার সস্তায় কিনিয়া যত পার চড়া দামে বেচিবে" এই যে ব্যবসার নিয়ম, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অপমানজনক আর কোনও নিয়ম নাই। "যত পার সস্তায় লইবে" ইহা ত বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সস্তা হইবে কেমন করিয়া? আগুন লাগিয়া বাড়ি পুড়িয়া গেলে কড়িকাঠের কয়লা সস্তা হইতে পারে, ভূমিকম্প হইয়া বাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িলে ইট সস্তা হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আগুন লাগা বা ভূমিকম্প হওয়া লোকের পক্ষে লাভজনক—একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারে না। "যত পার চড়া দামে বেচিবে" কথাটা ত বুঝা গেল, কিন্তু চড়া দাম আসিবে কোথা হইতে? আজ তুমি রুটির দাম খুব ভাল পাইয়াছ, কিন্তু সেই দাম কি তুমি অন্নাভাবে মরণাপন্ন লোকের শেষ কড়ি হইতে লইয়াছ? অথবা সেই রুটি কি মহাজনকে বেচিয়াছ, যে কাল তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইবে? অথবা কোনও সৈনিক ঐ দাম তোমাকে দিয়াছে, যে কাল তোমার ব্যাঙ্ক লুট করিবে? হইতে পারে এ সকল প্রশ্নের উত্তর তুমি এ সময় দিতে পার না—কেননা তুমি জান না। কিন্তু তুমি ন্যায্য মূল্য, নীতি অনুযায়ী লইতেছ কিনা তাহা ত বলিতে পার। আর ন্যায্য মূল্য রাখাই উচিত। তোমার কাজ হইতে কাহারও দুঃখ না হয় তাহা জানা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করা তোমার কর্তব্য।

আমরা দেখিয়াছি, টাকার দাম নির্ভর করে উহা দিয়া লোকের মজুরি কতটা পাওয়া যায় তাহার উপর। যদি বিনামূল্যে মজুরি পাওয়া যায়, তবে ত টাকার দরকারই হয় না। বিনা পয়সায় লোকের মজুরি পাওয়া যায়, এ প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। টাকা অপেক্ষা নীতি-বল দ্বারা অধিক কাজ হয়—এ প্রকার উদাহরণ ত আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। যেখানে টাকা দিয়া কাজ করানো যায়, সৎপ্রবৃত্তি দ্বারাও সেখানে কাজ করানো যায়। ইংলণ্ডে অনেক স্থানে মানুষকে পয়সা দিয়া ভুলানো যায় না।

আবার যদি আমরা একথা স্বীকার করি যে, লোকের নিকট হইতে কাজ লওয়ার শক্তির নামই ধন, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, লোকে যে পরিমাণে নীতিপরায়ণ ও চতুর হয় সেই পরিমাণেই ধন-দৌলত বাড়ে। এই প্রকার বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যকার ধন সোনা রূপা নয়। খাঁটি ধন ত মানুষ নিজে! ধনের সন্ধান ভূগর্ভে করার দরকার নাই, মানুষের

হৃদয়েই উহার সন্ধান করিতে হয়। আর যদি একথা সত্য হয়, তবে অর্থ-শাস্ত্রের ত নিয়ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষের দেহ, মন ও প্রাণের স্বাস্থ্য রক্ষা করাই সত্যকার সম্পদ। এমন এক সময় আসিবে যখন ইংলণ্ড, গোলকুণ্ডার হীরকে নিজের দাসদিগকে সজ্জিত করা দ্বারা দৌলত না দেখাইয়া, গ্রীসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত নিজেদের নীতিপরায়ণ মহাপুরুষদিগকে দেখাইয়া বলিতে পারিবে যে, "ইহারাই আমার ধন-দৌলত"।

যথার্থ ন্যায়

খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে একজন ইহুদী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সলোমন। তাঁহার অনেক ধন ছিল ও যশও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার কথিত বাক্য আজও ইউরোপে প্রচলিত আছে। ভেনিসের লোকেরা তাঁহার এত মান্য করিত যে, তাঁহার মূর্তি নির্মাণ করে। যদিও তাঁহার বাক্য আজও লোকে মুখস্থ করিয়া থাকে, তবুও সে অনুসারে কম লোকই চলিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন—"যে মিথ্যা বলিয়া অর্থ উপার্জন করে তাহারা অহংকারী ও তাহাদের ঐ অর্থ মৃত্যুরই চিহ্ন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে—"অন্যায়কারীর ধন দ্বারা কোন লাভ হয় না, সত্যই মৃত্যু হইতে বাঁচায়।" এই উভয় বাক্য দ্বারা সলোমন বলিতেছেন যে, অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থের পরিণাম মৃত্যু। আজকাল এমন সুন্দর ভাবে মিথ্যা বলা হয়, মিথ্যা আচরণ করা হয় যে, সাধারণতঃ উহাকে মিথ্যা বলিয়াই ধরি না। যেমন ধরুন, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে, লোক ভুলাইবার জন্য জিনিস-পত্রের উপর মিথ্যা কথা-পূর্ণ লেবেল আঁটিয়া দেওয়া থাকে ইত্যাদি।

আবার সেই জ্ঞানীই বলিয়া গিয়াছেন যে—"যাহারা ধন বাড়াইবার জন্য গরিবকে পীড়ন করে, তাহাদের অন্তকালে ভিক্ষাই করিতে হয়।" তিনি আরো বলেন—"গরিবকে ক্লেশ দিবে না, কেননা তাহারা গরিব। ব্যবসা ব্যাপারেও পীড়িতদিগের উপর জুলুম করিও না, কেননা যাহারা গরিবকে দুঃখ দেয় তাহাদিগকে ঈশ্বর দুঃখ দিয়া থাকেন।"

তাহা হইলেও আজকাল ত ব্যবসার কার্যে যাহারা মৃতপ্রায় তাহাদিগকে ঠোক্কর মারা হয়। যাহারা ব্যথিত তাহাদের নিকট হইতেও লাভ আদায় করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। ডাকাতেরা ধনীর গৃহেই ডাকাতি করে। কিন্তু ব্যবসার ভিতর দিয়া ত গরিবকেই লুটিয়া লওয়া হয়।

সলোমন আরো বলেন—"ধনী ও নির্ধন উভয়েই সমান। ঈশ্বর উভয়কেই উৎপন্ন করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন।" "ধনীর গরিব ব্যতীত, আর গরিবের ধনী ব্যতীত চলে না, একের সহিত অপরের সংযোগ সর্বদাই হইতেছে। সেইজন্যই ইহাদের কেহ কাহাকেও উচ্চ বা নীচ বলিতে পারে না। কিন্তু তাহারা যে সমান একথা যখন ভুলিয়া যায়, যখন ঈশ্বরই তাহাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন একথা তাহারা ভুলিয়া যায়, তখন বিপরীত পরিণাম দেখা দেয়।"

ধন-সম্পদ নদীর মত। নদী সকল সময় সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ নিম্নদিকে যায়। তেমনি দৌলতেরও যেখানে আবশ্যক সেইখানেই যাওয়া চাই ; ইহাই নিয়ম। আবার যেমন নদীর গতির পরিবর্তন হইতে পারে, তেমনি দৌলতের গতিরও পরিবর্তন হইতে পারে ; যখন নদীর প্রবাহ একবার এদিকে একবার সেদিকে দিয়া চলে তখন সেখানে জমিয়া যায় ও বিষাক্ত হাওয়া উৎপন্ন করে। সেই নদীকে বাঁধ দিয়া উহার জল যেখানে প্রয়োজন সেখানে লওয়া হয়, জল তখন ভূমিকে রসাল করে ও আশপাশের হাওয়া সুন্দর হয়। তেমনি ধনের যদি যথেচ্ছা ব্যবহার হয় তবে মানুষের মধ্যে অন্যায় বাড়ে, অনাহার চলে, সংক্ষেপে সেই দৌলত বিষের ন্যায় হয়। কিন্তু যেখানে দৌলত-নদীর গতি বাঁধিয়া দেওয়া হয়, সেখানে তাহাকে নিয়ম মত ব্যবহার করিলে তাহা সুখদায়ক হইয়া উঠে।

অর্থশাস্ত্রীরা দৌলতের গতি নিয়ন্ত্রিত করার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রীদের শাস্ত্র কি করিয়া ধন সঞ্চয় হইবে তাহারই শাস্ত্র। কিন্তু ধন-দৌলত ত নানা রকমেই সংগ্রহ করা যায়। এমন একদিন ছিল যখন ইউরোপে ধনশালী লোককে বিষ দিয়া মারিয়া তাহার ধন লইয়া লোকে ধনশালী হইত। আজকালকার দিনে গরিব লোকের জন্য যে খাদ্য তৈরি করা হয় তাহাতে ভেজাল দেওয়া হয়। দুধে সোহাগা দেওয়া হয়, আটায় আলুর ভেজাল দেওয়া হয়, কফিতে ভেজাল থাকে, মাখনে চর্বি দেওয়া হয়, ইত্যাদি। ইহাও ত বিষ দিয়া টাকা করার সমান। আর আমরা ইহাকেই ধনবান হওয়ার কৌশল অথবা শাস্ত্র বলিয়া থাকি।

লুট করিয়া পয়সা কর—ঠিক একথাটাই অর্থশাস্ত্রীরা বলে না। তাহারা বলে, তাহাদের শাস্ত্র নিয়মমত ও ন্যায্য উপায়ে ধনবান হওয়ার শাস্ত্র। আজকাল দেখা যায় যে, অনেক বস্তু নিয়ম মত হইলেও নীতি-বিরুদ্ধ।

সেইজন্যই ন্যায়ের নীতি পালন করিয়া অর্থ উপার্জন করাই খাঁটি পথ। আর যদি ন্যায়-পথে অর্থ উপার্জন করাই ঠিক হয়, তবে মানুষকে প্রথমেই ন্যায়-বুদ্ধির শিক্ষা দেওয়া চাই। কেবল লেনদেনের বুদ্ধিতেই ব্যবসা করা চলে না। মাছেরা, নেকড়ে বাঘেরা ও ইন্দুরেরাও ঐ লেনদেনের নিয়মই পালন করে। বড় মাছ ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে, বাঘ ত মানুষ পর্যন্ত খাইয়া ফেলে, তাহাদের রীতিই এই। তাহারা ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান দিয়াছেন, ন্যায় বুদ্ধি দিয়াছেন। উহার ব্যবহার করিয়া অপরকে খাইয়া, ঠকাইয়া, ভিখারী করিয়া, নিজের ধনশালী হইতে নাই।

এখন তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হয় যে, মজুরকে মজুরি দেওয়ার ন্যায়টা কি রকম?

আমরা পূর্বে বলিয়া গিয়াছি যে, মজুরের ন্যায্য বেতন হইতেছে, আজ সে আমাদের জন্য যাহা করিতেছে, তদনুরূপ মজুরি তাহাকে তাহার দরকারের জন্য ফিরাইয়া দেওয়া। সে যদি কম দিয়া থাকে তবে কম দেওয়া, আর যদি বেশি করিয়া থাকে তবে বেশি ফেরত দেওয়া।

একজন লোকের মজুর আবশ্যক। তাহার কাছে দুইজন মজুর আসে, উহাদের মধ্যে যে কম লয় তাহাকেই মজুরি দেওয়ায় সে লোক কম পাইবে। আবার যদি বেশি লোকে মজুর ডাকে আর মজুর থাকে মোট একজন, তখন সে যে দাম চায় তাহাই পায় এবং অনেক সময় এই ক্ষেত্রে সাধারণ অপেক্ষা অধিক মজুরিই সেই মজুর আদায় করিয়া থাকে। এই উভয় ক্ষেত্রেই মজুরিকে ন্যায্য মজুরি বলা হইয়া থাকে।

কেহ যদি আমাকে ধার দেয় ও নির্দিষ্ট দিনে তাহা শোধ দিতে হয়, তবে সে ব্যক্তিকে সুদ দিয়া থাকি। তেমনি যদি কোনও লোক আমার জন্য মজুরি খাটে, তবে তাহাকে সেই মজুরি শোধ দিতে হয় ও উপযুক্ত সুদ দিতে হয়। আজ যদি আমার জন্য কেহ এক ঘণ্টা মজুরি করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য আমার এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট বা তাহার অধিক সময়ের কাজ দেওয়ার জন্য কথা দিতে হয়। প্রত্যেক মজুরির সম্বন্ধেই ইহাই খাঁটি—একথা বুঝা চাই।

এক্ষণে আমার কাছে যদি দুইজন মজুর আসে ও তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি কম চায় তাহাকে কাজে লওয়া হয়, তবে তাহার ফল এই হয় যে, সে ব্যক্তি অর্ধেক খাইয়া থাকে! আর যে রোজগার করিতে পারিল না, সে ত পুরাপুরি

বুভুক্ষু রহিয়া গেল। যে মজুরকে আমি রাখিলাম তাহাকে যদি ন্যায্য মজুরি দিই, তাহা হইলেও দ্বিতীয় মজুর কাজ না পাইয়া যে বসিয়া থাকা, তাহা থাকিবে। কিন্তু তবু যাহাকে আমি রাখিয়াছি অন্ততঃ তাহাকে যাহাতে আধপেটা খাইতে না হয় তাহাই দেখা দরকার এবং তাহাতে আমার অর্থেরও সদ্ব্যবহার হয়। আমি যদি উচিত মজুরি দিই তাহা হইলে আমাদের কাছে অন্যায় ধন সঞ্চিত হইতে পারে না। যদি ভোগ-বিলাসে অর্থ ব্যয় না করি, তাহা হইলে আমার দ্বারা দারিদ্র্য বাড়িবে না। যদি আমি ন্যায্য মজুরি দিই তবে সে ব্যক্তিও ন্যায্য মজুরি দিতে শিখিবে এবং এমনি করিয়া ন্যায়ের প্রস্রবণ না শুখাইয়া গিয়া বরঞ্চ বাড়িয়া যাইবে, আর যে প্রজার ভিতর এই বুদ্ধি কার্য করিবে তাহাদের সুখ হইবে ও উন্নতি বাড়িতে থাকিবে।

এই বিচার অনুসারে অর্থশাস্ত্রীদের দোষই দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, যাহাতে প্রতিযোগিতা বাড়ে তাহাতেই প্রজার সুখ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই কথা ভুল। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যও মজুরির দাম কমানো। উহাতে, যাহার অর্থ আছে সে অধিক অর্থ করে, আর যে গরিব সে আরো গরিব হইয়া পড়ে। এই প্রতিযোগিতার অবশেষে প্রজার নাশই হয়। লেনদেনের নিয়ম ত এই প্রকার হওয়া চাই যে, প্রত্যেক লোকই যোগ্যতা অনুযায়ী মজুরি পাইতে পারে!

প্রতিযোগিতা থাকিলে পরিণাম এই হইবে যে, লোকে সুখী ও কুশল হইয়া পড়িবে। কেননা এই প্রকার হইলে কাজ পাওয়ার জন্য ত আর মজুরি কমাইতে হইবে না, সেজন্য কেবল কর্মকুশল হইতে হইবে। এইজন্যই লোকে সরকারী কাজ পাওয়ার ইচ্ছা করিয়া থাকে। সেখানে গ্রেড্ অনুসারে বেতন বাঁধা আছে—প্রতিযোগিতা কেবল কুশলতার উপর গিয়া দাঁড়ায়। নিযোক্তা কম বেতন লইতে বলে না, কেবল অপরের অপেক্ষা অধিক কুশলতা আছে ইহাই দেখাইতে বলে। নৌ-সৈন্যের মধ্যে ও সিপাহীদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রতিপালিত হয়। আর সেইজন্যই এইসকল বিভাগে গোলমাল ও দুর্নীতি অনেকটা কম দেখা যায়। তাহা হইলেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা রহিয়া গিয়াছে। আর তাহার ফলে প্রতারণা, অসচ্চরিত্রতা, চুরি ইত্যাদি দুর্নীতি বাড়িতেছে। আবার অন্যদিক দিয়া, যে মাল তৈয়ারি হইতেছে তাহাও খারাপ, নীরস হইতেছে। ব্যবসায়ী ভাবে আমি আদায় করিয়া লই, মজুর ভাবে আমি ঠকাই, আর

গ্রাহক ভাবে মাঝখান হইতে আমি সুবিধা করিয়া লই! এইভাবে ব্যবহার-পদ্ধতি দোষ-যুক্ত হয় এবং অনাহারক্লিষ্ট লোক বাড়ে, ধর্মঘট বাড়িয়া যায়, মহাজনেরা ঠক হইয়া যায় ও গ্রাহকেরাও নীতি পালন করে না। এক অন্যায় হইতে অন্য অন্যায় উপস্থিত হয়, অবশেষে মহাজন ও গ্রাহক সকলেই দুঃখী হয় ও নষ্ট পায়। যে প্রজার ভিতর এই রীতি চলিতে থাকে, সে প্রজা পরিণামে হয়রান হইয়া পড়ে, প্রজার অর্থই বিষের মত হইয়া পড়ে।

সেইজন্যই জ্ঞানীরা বলিয়াছেন—

"যেখানে অর্থই পরমেশ্বর সেখানে সত্য ঈশ্বরকে কেহ পূজা করে না।"

"ধনের সহিত আর ঈশ্বরের সহিত অবনিবনাও আছে। গরিবের ঘরেই ঈশ্বর বাস করেন।" ইংরেজেরা এই সকল কথা মুখে বলিলেও তাঁহারা অর্থকেই সর্বোপরি স্থান দিয়া থাকেন। প্রজা বলিতে কেবল ধনীদের হিসাব করিয়াই প্রজার সুখ হইয়াছে দেখিয়া থাকেন। সেখানে অর্থশাস্ত্রীরা কি করিয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেই নিয়মই গড়িয়া থাকেন, উহা শিখিয়া প্রজা অর্থসঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু সত্য অর্থশাস্ত্র ত ন্যায়-বুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে কোনও অবস্থায় পড়িয়া কেমন করিয়া ন্যায় আচরণ করা যাইবে, নীতি পালন করা যাইবে এই শাস্ত্র যে জনসাধারণ শিক্ষা করে তাহারাই সুখী হয়। বাকি আর যাহা তাহা ত ফাঁকা ও বিনাশকালের বিপরীত বুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া যায়। জনসাধারণকে যেমন করিয়া হোক অর্থ উপার্জন করিতে শেখানো মানে তাহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধিই শেখানো।

সত্য কি

গত তিন অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, অর্থশাস্ত্রীরা যাহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন তাহা ঠিক নহে। সে নিয়ম অনুযায়ী চলিলে লোকে দুঃখীই হইয়া থাকে। গরিব আরও গরিব হয় ও ধনবান আরও ধনী হয়, আর এই দুইয়ের মধ্যে কেহই সুখী হয় না।

অর্থশাস্ত্রীরা লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও বিবেচনা করে না, যাহার পয়সা বেশি তাহারই উন্নতি বেশি এই প্রকার গণ্য করে। লোকের সুখ কেবল পয়সার উপরই নির্ভর করে বলিয়া তাহারা মনে করে। আর সেইজন্য

তাহারা একথাই শিক্ষা দেয় যে, কারিগর প্রভৃতি যাহাতে বেশি পয়সা সঞ্চয় করিতে পারে তাহাই ভাল। এইপ্রকার বিচার হইতেই ইংলণ্ডে ও অন্যস্থানে কারখানা বাড়িয়া গিয়াছে, অনেক লোক শহরে একত্রিত হইতেছে ও চাষের কাজ ছাড়িয়া দিতেছে। বাহিরের সুন্দর নির্মল হাওয়ার বদলে নোংরা হাওয়ায় সারাদিন শ্বাসপ্রশ্বাস করাতেই সুখ বোধ করে, ফলে হয় যে, লোক দুর্বল হইয়া পড়ে, দুর্নীতি বাড়িয়া যায় ও যখন দুর্নীতি দূর করার কথা পাড়া হয়, তখন জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, দুর্নীতি ত দূর করা যায় না, অজ্ঞানী লোকের একবারেই জ্ঞান আসিতে পারে না, সেইজন্য যেমন চলিতেছে, চলিতে দাও। এইভাবে যখন তাঁহারা বলেন, তখন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে গরিবের দুর্নীতির হেতুই হইতেছেন ধনীরা। তাহাদেরই ভোগবিলাসের জন্য গরিবেরা রাতদিন দাসত্ব করিতেছে। তাহাদের শিক্ষা করার বা ভাল কাজ করার মুহূর্ত সময়ও থাকে না। ধনীকে দেখিয়া তাহারা ধনী হইতে চায়। ধনী হইতে পারে না বলিয়া ক্লেশ বোধ করে, রাগ করে ও পরে জ্ঞানহীন হইয়া ভাল রাস্তায় ধন উপার্জন করিতে না পারিয়া মন্দ রাস্তায় রোজগার করার চালাকি খোঁজে। এমনি করিয়া পয়সা ও মজুরি দুইই ব্যর্থ যায় অথবা দাগাবাজির কাজে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে খাঁটি মজুরি ত তাহাকেই বলে যাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। সেই সকল জিনিসকেই প্রয়োজনীয় বলা যায়, যাহা লোকের ভরণ পোষণে লাগে, আবার ভরণ পোষণ তাহাকেই বলে যাহাতে মানুষ তাহার খাওয়া-পরার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইয়া নীতি-মার্গে থাকিয়া জীবন ধারণের জন্য সৎকর্ম করে। এই ধরণে বিচার করিলে মহা-আড়ম্বর-পূর্ণ কাজ সকলও অকাজ বলিয়া মনে হইবে। কারখানা খাড়া করিয়া ধনাঢ্য হওয়ার রাস্তা লইলে পাপকর্ম হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। পয়সা ত অনেকেই রোজগার করিয়া থাকে, কিন্তু যথোচিত ব্যবহার করার লোক কমই আছে। যে পয়সা উপার্জন করায় লোকের ক্ষতি হয়, সে প্রকার পয়সা রোজগার করিতে নাই। তাহা হইলে এখন যাহারা ক্রোড়পতি, তাঁহারাও বড় ও দুর্নীতি-পূর্ণ সংগ্রামের কারণ হইয়া থাকেন। আজ কালকার অনেক যুদ্ধের কারণ অর্থ-লালসা বলিয়াই দেখা যায়।

লোকে এরূপ বলিয়া থাকে যে, অপরকে জ্ঞান দান করা, সভ্য করা—এ হইয়া উঠে না। সেইজন্য যেমন ইচ্ছা থাকিবে ও পয়সা রোজগার করিবে।

এরূপ যাহারা বলে তাহারা নিজেই নীতি পালন করে না। কেননা যে ব্যক্তি নীতি পালন করে ও লোভে পড়ে না, সে ব্যক্তি নিজের মন আগে স্থির রাখে। নিজে খারাপ রাস্তায় চলে না ও নিজের কর্মদ্বারা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যাঁহারা সমাজ সৃষ্টি করেন তাঁহারা নিজেরাই যদি নীতির নিয়ম পালন না করেন, তবে জনসাধারণ কি করিয়া নীতি-পরায়ণ হইবে? আমি নিজে যেমন খুশি থাকিব, আর প্রতিবেশীর দুর্নীতির জন্য তাহার ভুল ধরিব, ইহাতে কি আর ভাল ফল হইতে পারে?

এইভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, টাকা পয়সা একটা সাধন বা উপায় মাত্র। এবং উহা দ্বারা সুখ ও দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়। যদি ভাল লোকের হাতে টাকা আসিয়া পড়ে তবে উহা দ্বারা সে চাষের কাজ করায়, অন্নাদি উৎপন্ন করায়, নির্দোষ মজুরি করিয়া সন্তোষ লাভ করে ও লোকে সুখী হয়। খারাপ লোকের হাতে টাকা আসিয়া পড়িলে হয়ত বা ধরুন, উহা দ্বারা গোলা বারুদ তৈয়ারি হয়, লোকের সত্য নাশ হয়। যাহারা গোলা বারুদ প্রস্তুত করে ও যাহাদের উপর ব্যবহার করে, সে উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়।

ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খাঁটি লোকই খাঁটি দৌলত। যে জনসাধারণের নীতি আছে তাহাদেরই দৌলত আছে। ইহকালটা ভোগ বিলাস করার জন্য নয়। প্রত্যেক লোকেরই যথাশক্তি মজুরি করা উচিত। আমরা পূর্বের উদাহরণে দেখিয়াছি যে, যেখানে একজন লোক অলস থাকে সেখানে অপর একজনের ডবল কাজ করিতে হয়। ইংলণ্ডে যে অন্নাভাব-ক্লিষ্ট লোক রহিয়াছে তাহার ইহাই কারণ। কতকগুলি লোকের নিকট অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তাহারা উপযুক্ত কাজ করিতেছে না। আর সেইহেতুই, তাহাদের জন্যই অপর লোকের মজুরি খাটিতে হয়। আর এই মজুরি ঠিক নয় বলিয়া যাহারা খাটে তাহাদের লাভ হয় না। এই অবস্থায় লোকের অভাব উপস্থিত হয় এবং যদিও বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, লোকে কাজ পাইতেছে, কিন্তু ভিতরে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অনেক লোক নিষ্কর্মা বসিয়া আছে। আবার ইহাতে দ্বেষ ভাব উপস্থিত হয়। অসন্তোষের মূল প্রবেশ করে এবং ধনবান ও গরিব, মনিব ও মজুর উভয়েই সীমার বাহিরে গিয়া পড়ে। যেমন বিড়ালে

ইঁদুরে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, ধনীতে গরিবে, মনিবে মজুরে সর্বদাই সেই প্রকার বৈরভাব বর্তমান থাকে, আর মানুষ মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া পশুর দশা প্রাপ্ত হয়।

উপসংহার

মহামতি রাস্কিনের বক্তব্যের মর্ম আমার বলা শেষ হইল। এই লেখা যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' সকল পাঠকই যে এই অনুযায়ী চলিবেন এ প্রকার আশা করা যায় না। কিন্তু যদি খুব অল্প সংখ্যক পাঠকও ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, ইহার সারাংশ গ্রহণ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আর যদি তাহা নাও হয়, তাহা হইলেও রাস্কিনের শেষ অধ্যায় অনুযায়ী আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছি, উহাতেই আমার ফললাভ হইয়াছে, উহাতেই আমার সন্তোষ পাওয়ার কাজ হইয়াছে।

রাস্কিন তাঁহার ইংরেজ ভ্রাতাদের জন্যই ইহা লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা ইংরেজদের জন্য যদি একবার বলা চলে, ভারতবাসীর পক্ষে তাহা হাজার বার খাটে। ভারতবর্ষে নতুন ধরণের সংস্কার প্রচলিত হইতেছে। আজকাল যে সমস্ত যুবক পশ্চিম দেশের শিক্ষা পাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে উদ্যম দেখা দিতেছে—একথা ঠিক। এই উদ্যমের সদ্ব্যবহার হইলেই ভাল ফল হইবে, আর উহা যদি মন্দ দিকে যায় তবে খারাপ ফলই হইবে। স্বরাজ পাওয়ার জন্য আহ্বান একদিক হইতে আসিতেছে। আবার আর একদিক হইতে বিলাতের মত কারখানা করিয়া তাড়াতাড়ি অর্থ উপার্জন করার ডাকও শুনা যাইতেছে।

স্বরাজ্য যে কি তাহা আমরা বড় একটা বুঝি না। নাতালের স্বরাজ্য আছে। কিন্তু আমরা যদি নাতালের মতই স্বরাজ্য চাই, তবে সে স্বরাজ্য নরক রাজ্যের মতই হইবে। উহারা কাফ্রিদিগকে দলিত করিতেছে, ভারতীয়দিগকে হত্যা করিতেছে। স্বার্থান্ধ হইয়া স্বার্থ রাজ্যই ভোগ

করিতেছে। যদি কাফ্রিরা ও ভারতবাসীরা সে দেশ হইতে চলিয়া যায়, তবে উহারা নিজেরা নিজেরাই লড়াই করিয়া শেষ হইয়া যাইবে।

তাহা হইলে কি ট্রান্সভালের মত স্বরাজ্য চাই? জেনারেল স্মাটস সেখানকার প্রধানদিগের মধ্যে একজন। তিনি নিজেই নিজের দেওয়া উদাহরণ বা নিজের দেওয়া বচন পালন করেন না। এক কথা বলেন, অন্য এক কাজ করেন। ইংরেজ তাঁহাকে ভয় করে। তিনি ব্যয় সংক্ষেপের অছিলায় ইংরেজ সিপাহীদের অন্ন মারিয়া সে স্থানে ডচ সিপাহী রাখিতেছেন। আমি মনে করি না যে, পরিণামে ডচরাও ইহাতে সুখী হইবে। যাহাদের দৃষ্টি স্বার্থের দিকে, তাহারা পরের প্রজা লুণ্ঠন করিয়া পরে নিজের প্রজাকে লুটিতে সহজেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সর্বত্র খুঁজিয়া দেখি যে, স্বরাজ্য নামে পরিচিত রাজ্য প্রজার উন্নতি বা সুখের যথেষ্ট নয়। একটা সহজ উদাহরণ লইলে সহজেই বুঝিতে পারিব। লুণ্ঠনকারীদের দলে যদি স্বরাজ্য আসে, তবে পরিণাম কি হইবে, তাহা সকলেই দেখিতে পারেন। তাহাদিগকে আর কেহ লুটিতে পারিবে না যখন লোকের উপর তাহারা এই প্রকার অধিকার খাটাইতে পারিবে, তখনই তাহারা সুখী হইবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এ সকলই বড় বড় রাজ্য, কিন্তু তাহারাও যে যথার্থ সুখী তাহা মনে করার কারণ নাই।

'স্বরাজ্য' শব্দের যথার্থ অর্থ হইতেছে নিজের উপর অধিকার রাখিতে শিক্ষা করা। একাজ সেই করিতে পারে, যে নিজে নীতি পালন করে, অপরকে ঠকায় না, নিজের বাপ মা, নিজের স্ত্রী, সন্তান, চাকর ও প্রতিবেশী— এ সকলের প্রতিই নিজের কর্তব্য পালন করে। এই প্রকার ব্যক্তি যে দেশে বাস করুক না কেন, সে স্বরাজ্য ভোগ করে। যে দেশের লোকের মধ্যে এই প্রকারের লোক অনেক আছে, সে দেশে স্বভাবতঃই স্বরাজ রহিয়াছে।

এক দেশের লোক অপর দেশের উপর রাজত্ব করিবে সাধারণতঃ তাহা দোষনীয় বলিয়া গণ্য। ইংরেজেরা আমাদের উপর রাজত্ব করে ইহা অন্যায় কথা। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজেরা হিন্দুস্থান ত্যাগ করিলেই হিন্দুস্থানের ভাল হইল বলিয়া মনে করার দরকার নাই। তাহারা যে রাজ্য করে তাহার কারণ ত আমরাই। সে কারণ হইতেছে আমাদের অন্যায়, আমাদের দুর্নীতি ও আমাদের অজ্ঞতা। এই তিন বস্তু যদি দূর হয়, তাহা হইলেই আমরা যথার্থ স্বরাজ ভোগ করিতে থাকিব।

বোমা ছোড়ার কথায় অনেকেই খুশি হন দেখা যায়। ইহা কেবল অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন। সমস্ত ইংরেজকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোক যদি ভারতে অনেক থাকে, তবে ভারতবর্ষের বিধবার অবস্থা হইবে। যে বোমা ইংরেজকে মারিবে, ইংরেজ গেলে পরে তাহা ভারতবাসীর উপরই পড়িবে। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টকে ফরাসীরাই মারিয়াছিল। আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট ক্লীভল্যাণ্ডকে আমেরিকানরাই মারিয়াছেন। সেইজন্যই তাড়াতাড়ি পশ্চিমের লোকের নকল করার মত অন্ধ হওয়া আমাদের উচিত নহে।

যেমন পাপ কর্মদ্বারা অর্থাৎ ইংরেজ মারিয়া যথার্থ স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারে না, তেমনি ভারতবর্ষে কতকগুলি কারখানা খুলিলেই স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। কেবল সোনা-রূপা একত্র করিলেই যে রাজ্য পাওয়া যাইবে না, একথা রাস্কিন পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমের সভ্যতা মাত্র একশত বৎসরের পুরাণো—যথার্থ বলিতে গেলে পঞ্চাশ বৎসর ধরা যায়। ইহার মধ্যেই ইউরোপের লোকসমূহ বর্ণ-সংকর হওয়ার মত হইয়াছে। ইউরোপের যে অবস্থা হইয়াছে ভারতবর্ষের কখনো তাহা না হয়, আমি এই কামনা করি। ইউরোপের লোকেরা একে অন্যের উপর চাপিয়া বসিতেছে। মাত্র নিজেরা নিজেরা তৈরি হওয়ার জন্যই সকলে চুপচাপ আছে। যদি কোনও সময় একটা বড় হাঙ্গামা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইউরোপে নরক জ্বলিয়া উঠিবে। ইউরোপের প্রত্যেক রাজ্যই কালা লোককে ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে। যেখানে কেবল টাকা বা পয়সার লোভই সম্বল, সেখানে অন্য আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি তাহারা কোনও একটা রাজ্য দেখিতে পায়, তাহা হইলে চিল যেমন মাংস দেখিলে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তেমনি চিলের মত সেই দেশের উপর গিয়া ছোঁ মারিয়া পড়ে। উহাদের কারখানার জন্যই এমন করে, একথা মনে করার হেতু আছে।

সকল ভারতবাসীই বলেন—স্বরাজ চাই। একথা সত্য। কিন্তু এই স্বরাজ নীতিপথে থাকিয়াই পাইতে হইবে, উহাই যথার্থ স্বরাজ্য হইবে। ইংরেজ হত্যা করার পথে বা কারখানা দ্বারা উহা পাওয়া যাইবে না। উহার জন্য উদ্যম চাই। আবার সে উদ্যম সে চেষ্টাও ঠিক পথে করা চাই। এককালে এই ভারতভূমিকে স্বর্ণভূমি বলা হইত। তাহার কারণ ভারতবাসীরাই

সোনার মত ছিল। ভূমি ত এখনো তাহাই আছে—কেবল মনুষ্যগুলি বদলাইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই ভূমি উজাড় হইয়া গিয়াছে। ইহাকে আবার স্বর্ণভূমি করিতে হইলে আমাদিগকেই সদগুণ দ্বারা স্বর্ণ হইতে হইবে। এই স্বর্ণ করার পরশপাথর দুইটি অক্ষরের মধ্যে আছে, উহা 'সত্য'। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী সত্যেরই আগ্রহ রাখে, তাহা হইলে ভারতবাসী ঘরে বসিয়াই স্বরাজ পাইবে।

সমাপ্ত